২য় সংখ্যা

চতুর্দশ বর্ষ

চৈত্র, ১৩৬৭

শুকতারা

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ঃ ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্ক্যান ঃ শুভঙ্কর ঘোড়ুই

এডিট ঃ হারিদাস পাল

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন ।

e-mail: optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

"শুকতারা" পড়ছো যে-সব ভাইবোনেরা—

কাগজ

যে কত দামী, তা' তোমরা জানো। সাহিত্য, ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র ভোজ এই কাগজের পাতায় ক'রে পরিবেশন করেছেন বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীরা তোমাদের কাছে। এই কাগজের সম্মান তোমরাই রাখবে—তার সত্যিকারের সদ্ব্যবহার দ্বারা, অর্থাৎ লেখাপড়ায়।

●

রঘুনাথ দত্ত এণ্ড সন্স

(প্রাইভেট) লিমিটেড

কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি, লেখন-সামগ্রী

ইত্যাদি বিক্রেতা

"রঘুনাথ বিল্ডিংস্"—৩২-বি, ব্রাবর্ণ রোড, কলিকাতা-১

●

—শাখা—

কলিকাতার সর্ব্বত্র, উত্তরপ্রদেশ, আসাম, বিহার ও উড়িষ্যা

ফোন—২২-৪৯৯১ পোঃ বক্স—৭৬২ তার—"নোটপেপার"

"শুকতারা"

Approved by the Text-Book Committee, Bihar, as a Supplementary Reader in Secondary and Primary Schools (Children's Monthly Journal)

(*Vide Patna Gazette, 30th Dec. 1950*).

সূচীপত্র—চৈত্র, ১৩৬৭

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১ ।	মামা ভাগ্নে (চিত্র-পরিচয়) …	শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	মুখপত্র
২ ।	চৈত্র ভোর (কবিতা) …	ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায় …	৯৫
৩ ।	সার্থক শিক্ষা (মজার গল্প) …	বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ …	৯৬
৪ ।	মিতালির মালা (গল্প) …	স্বপনবুড়ো …	৯৭
৫ ।	গাঁয়ের ডাক (কবিতা) …	শ্রীজয়ন্তকুমার পাঠক …	১০৪
৬ ।	টারজানের উনপঞ্চাশতম অ্যাডভেঞ্চার …	সব্যসাচী …	১০৫
৭ ।	হেডমাস্টারের কড়া শাসনে (গল্প) …	ডাঃ ইন্দু পাল …	১১৪
৮ ।	সুন্দর ও ভয়ংকর (চিত্র-পরিচয়) …	…	১১৮
৯ ।	ভোরের আলো (সত্য ঘটনা) …	শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৯
১০ ।	উজল পাতা (চিত্র-পরিচয়) …	…	১২৪
১১ ।	ঠকবে না (মজার গল্প) …	…	১২৪
১২ ।	বাস্তুভিটা (গল্প) …	শ্রীগণেন্দ্র চক্রবর্তী …	১২৫
১৩ ।	আকস্মিক দুর্ঘটনা (স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা) …	…	১২৮
১৪ ।	নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচাও (সত্যকাহিনী অবলম্বনে) …	আরতি ঘোষ …	১২৯
১৫ ।	মানুষ জাগাল যারা (ঐতিহাসিক গল্প) …	বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য …	১৩৫
১৬ ।	"পাপিয়া স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)	…	১৪২
১৭ ।	"সবার উপর মানুষ সত্য" (কবিতা) …	শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাস …	১৪৩
১৮ ।	নিশি রাতের আগন্তুক (ছেলেদের ধারাবাহিক উপন্যাস)	নীহাররঞ্জন গুপ্ত …	১৪৪
১৯ ।	ভুট্টার দানা ফাটে কেন ? (জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা)	…	১৫২
২০ ।	গঁদের আঠায় জোড়ে কেন ? („) …	…	১৫২
২১ ।	'মারসী বক্‌'র দেশ (ভ্রমণ-কাহিনী)	'জাদুসম্রাট' পি. সি. সরকার	১৫৩

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
২২। একটুখানি হাসো (হাস্যকৌতুক) ...	...	১৬১
২৩। মেনি (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	সুশীল সিংহ ...	১৬২
২৪। মজার খেলা ...	...	১৬৬
২৫। বীরত্ব (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা) ...	কুমারী শিখা সেন ...	১৬৭
২৬। মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) ...		১৬৯
২৭। দাদুমণির চিঠি ...	...	১৭০

STATEMENT ABOUT OWNERSHIP AND OTHER PARTICULARS ABOUT NEWSPAPER (Suktara) TO BE PUBLISHED IN THE FIRST ISSUE EVERY YEAR AFTER THE LAST DAY OF FEBRUARY

FORM IV

1. Place of Publication—22/5B, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
2. Periodicity of its Publication—Once in a Month.
3. Printer's Name—S. C. Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—24, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
4. Publisher's Name—S. C. Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—24, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
5. Editor's Name—Madhusudan Mazumdar.
   Nationality—Indian.
   Address—21/1, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.
6. Names and Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital—Dev Sahitya Kutir Private Ltd.,
   21, Jhamapooker Lane, Calcutta-9.

I, Subodh Chandra Mazumdar, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. S. C. Mazumdar
Signature of Publisher

Date—2. 3. 61.

একদিনে এত শিকার !

মামা ভাগনে

—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

একটা শেয়াল ছিল ভয়ানক ধূর্ত। কাজ করবে না, কর্ম করবে না, খালি ধাপ্পাবাজী করে সকলকে ঠকিয়ে দিন কাটাবে!

একদিন ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হলো এক নেকড়ের সঙ্গে···শেয়াল হাসতে হাসতে বললে—এই যে মামা চিনতে পারো?···নেকড়ে তো অবাক! ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো শেয়ালের পানে। হেসে শেয়াল বললে—হুঁ, কি করে চিনবে বলো? ভাগনে গরীব হলে মানুষ মামারাই তাকে চিনতে পারে না, পাত্তা দেয় না···তুমি তো বুনো জানোয়ার-মামা! তা যাক্ গে···আমি এলুম এই বনে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে।

নেকড়ের মাথায় চড়াৎ করে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল! তার হিম্মত আছে···সাহস আছে, কিন্তু বুদ্ধিতে তেমন ধার নেই, তাই কোন দিকে উন্নতি হচ্ছে না। নেকড়ে একটু ভেবে বললে—হুঁ, আমিও একজন বিশ্বাসী জানোয়ার খুঁজছি···মানে যার সঙ্গে আধাআধি বখরায়···

নেকড়ের মুখের কথা লুফে নিয়ে শেয়াল বললে—তা হলে তো ভালোই হলো মামা। কাল থেকেই কাজে লাগা যাক। আধাআধি বখরা···কেমন?

পরের দিন নেকড়ের সঙ্গে শেয়াল রোজগারে বেরুলো! নেকড়ে মারলো ইয়া এক হরিণ।

দেখে শেয়াল বললে—পায়ের ধুলো দাও মামা! আমি তোমার ভাগনে···তোমার তাকত দেখে আমার ছাতি যেন দশ হাত বেড়ে উঠলো!

—এক কাজ করো ভাগনে, তুমি গিয়ে এ হরিণটাকে আমার গর্তে তোমার মামীর কাছে দিয়ে এসো। সন্ধ্যাবেলায় ফিরে দু'জনে ভাগ করে নেবো, এখানে ফেলে রাখলে পাঁচভূতে লুটে খাবে।

—যা বলেছো মামা! বলেই হরিণটাকে টানতে টানতে শেয়াল ফিরলো উল্টো পথে! নেকড়ের বাসার দিকে নয়, সোজা নিজের গর্তে এলো।

শেয়ালনী বললে—এত বড় হরিণ···অ্যাঁ!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—বরাত খুলেছে শেয়ালনী,···আমি আবার চললুম! বলেই ছুটলো সে···

জঙ্গলের ধারে নেকড়ে বসে আছে একরাশ খরগোশ মেরে। শেয়াল তো দেখেই অবাক!—তুমি এ কি করেছো মামা! একদিনে এত শিকার!

খুশী হয়ে নেকড়ে বললে—শিকারে আমার সঙ্গে পাল্লা দেবে, এমন জানোয়ার তো আমি দেখলাম না ভাগনে। শুধু একটি বিশ্বাসী ভাগীদারের অভাবে এতদিন চুপ করে ছিলুম। যাও, এগুলো তোমার মামীর কাছে রেখে, চট করে চলে এসো।

সেই একরাশ মরা খরগোশ নিয়ে শেয়ালটা নেকড়ী মামীর কাছে গেল ভাবছো? রামচন্দ্র! সে এলো নিজের গর্তে।

এদিকে সন্ধ্যা অবধি অপেক্ষা করে নেকড়ে বেরুলো শেয়ালের সন্ধানে, শেয়ালের গর্তে এসে দেখে, গর্ত ভোঁ-ভোঁ। থাকবার মধ্যে সেখানে পড়ে আছে সেই হরিণের দুটো শিং আর পায়ের খুর ক'খানা···ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে নেকড়ে টের পেয়ে গেল ভাগনের স্বরূপ।

চতুর্দশ বর্ষ ● ২য় সংখ্যা ● ১৩৬৭, চৈত্র

চৈত্র ভোর

ফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চৈত্র ভোর
বইছে জোর
দখিন বায়
‘আয় রে আয়’
আকুল সুর
যায় সুদূর।
পলাশ বন
উলাস মন
স্বপন ছায়।
কোমল পায়
আস্‌লো কে
রঙ মেখে
ফুলের দোল
দ্যাখ্‌ বিভোল।
ভ্রমর যায়
গোলাপ ছায়
মধুর স্বাদ
পায় অবাধ।
চাঁদের ডাক
শোন্‌ অবাক্‌
পরীর গান
বাঁশির তান
মাতায় বুক
জাগায় সুখ।
বরষ শেষ
নতুন বেশ
ধরায় আজ
শ্যামল সাজ।
কোকিল গায়
বকুল ছায়
খোকন ভাই
সময় নাই।

আমের বোল্
দুয়ার খোল্
গন্ধে তোর
কর বিভোর।
খোকার চোখ
ভর আলোক
পারুল ফোট্
খুকুর ঠোঁট

রাঙিয়ে আজ
নেইরে কাজ
দোদুল দুল
চাঁপার ফুল।
দুলছি খুব
আমরা চুপ্
ফুল বিভোর
চৈত্র ভোর।

সার্থক শিক্ষা

বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ছেলেবেলা থেকে রামবাবু তাঁর ছেলেকে হিসাব করা শেখাতেন। যখন দোকানে যেতেন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। দোকানীর সঙ্গে জিনিস নিয়ে দরদস্তুর করার সময় মাঝে মাঝে ছেলের গা টিপে সজাগ করে দিতেন। ভাবটা এই, বড় হলে ছেলে যাতে কারো কাছে না ঠকে যায়।

রামবাবুর চেষ্টা ব্যর্থ হবার নয়। তিনি ছেলেকে ঠিক যেভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলেন ছেলে বড় হয়ে তাই হলো। তার মত হিসেবী রামবাবুর বংশে তো নয়ই এমন কি সে পাড়াতেও কেউ ছিল না।

রামবাবু এখন বুড়ো হয়েছেন। একটা একটা করে দাঁত নড়ছে। দুই একটা পড়েও গেছে।

রামবাবুর ছেলে ক্যাবলারাম এখন সংসার দেখাশুনা করে খুব হিসেব করে।

একদিন রামবাবু ক্যাবলাকে বললেন, বাবা ক্যাবলা, বাঁদিকের দাঁতটা নড়ছে আজ কিছুদিন, খুবই লাগছে, একবার দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেলে হতো না।

ক্যাবলা ছেলেবেলা থেকেই বাবাকে ভক্তি করে এসেছে। বাবার কথায় তক্ষুনি রাজী। বাবাকে সঙ্গে করে একজন দাঁতের ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে হাজির হলো।

দাঁত পরীক্ষা শেষ হয়ে যাবার পর ডাক্তার বললেন, এ দাঁত তুলে ফেলতে হবে।

ক্যাবলা জিগ্যেস করে, কত ফি দিতে হবে?

ডাক্তার বললেন, একটা দাঁত তোলার ফি পাঁচ টাকা।

চোখ বড় বড় করে আশ্চর্য হয়ে ক্যাবলা বলে, ভারী ত দু মিনিটের কাজ তার মজুরি পাঁচ টাকা!

ডাক্তার বলেন, বেশ তো, দু মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট ধরেই তুলবো,—বলে সাঁড়াশি নিয়ে রামবাবুর দিকে এগিয়ে যান।

ডাক্তারের কথা শুনে চেয়ার ছেড়ে একলাফে মেঝেয় পড়ে প্রাণের ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে রামবাবু ডাক্তারখানা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। বুঝলেন, ক্যাবলার হাতে এবার প্রাণ যাবে।

মিতালির মালা

স্বপনবুড়ো

মিতালিটা শুরু হয়েছিল প্রথমে ছোটদের তরফ থেকেই। চৌধুরী বাড়ির গদা আর গাঙ্গুলী বাড়ির গন্‌শা এক স্কুলে, এক ক্লাসেই পড়ত; কিন্তু ভাবটা তখনো জমে ওঠেনি।

আসল মিতালি শুরু হল সরস্বতী পুজোর সময়—ইস্কুলের ছেলেদের পরিবেশন করতে গিয়ে। গদার লিকলিকে চেহারা, কিন্তু উৎসাহ অসীম। তাই সাধ্যের অতীত প্রকাণ্ড খিচুড়ির হাঁড়িটা নিয়ে যখন ছেলেমহলে পরিবেশন শুরু করল, তখন দূর থেকে গাঙ্গুলী বাড়ির গাঁট্টাগোট্টা গণেশ ওর বিপদের কথাটা বেশ বুঝতে পেরেছিল।

আর একটু হলেই ওই ভারী, গরম খিচুড়ির হাঁড়িটা নিয়ে একটি রোগা-পটকা ছেলের মাথার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত। এমন সময় ছুটে এসে হাঁড়িটা ধরে ফেলে গন্‌শা এই বিপত্তি থেকে গদাকে বাঁচিয়ে দিলে।

তারপর হাসতে হাসতে বললে, "তুমি পরিবেশন করতে ভালোবাসো, সে ত আনন্দেরই কথা। তবে ঠিকমতো কাজের ভাগাভাগি হওয়া চাই।"

গদা জিজ্ঞেস করলে, "কি রকম ভাগাভাগি হবে শুনি?"

গন্‌শা জবাব দিলে, "এই ধরো না কেন, গরম খিচুড়ি পরিবেশনের জন্যে রয়েছি আমি—গাঁট্টাগোট্টা গন্‌শা; আর হালকা বেগুন ভাজা দেবার জন্যে রয়েছ তুমি—লিকলিকে গদা। একেই বলে কাজের ঠিকমতো ভাগাভাগি।"

দুজনেই হাসতে লাগল।

কাজের ভাগাভাগি থেকেই ওদের ভাব। আর ভাব থেকেই আসল মিতালি।

সেই থেকে ইস্কুলের ছেলেদের মহলে গন্‌শার নাম হল—গরম খিচুড়ি, আর গদার নাম হল—বেগুন ভাজা।

হঠাৎ হয়ত টিফিনের ঘণ্টায় একটি ছেলে চীৎকার করে উঠল—

"গরম খিচুড়ি আসছে—"

অমনি সঙ্গে সঙ্গে আর একজন ফোড়ন কাটলে—

"বেগুন ভাজা হাসছে!"

ছেলেদের মধ্যে হাসির হুল্লোড় পড়ে গেল। মাস্টারমশাইরা কিন্তু কৌতুকটার কিছু বুঝতে পারলেন না।

এই ভাবে গন্‌শা যায় গদার বাড়ি—বই আনতে, আর গদা যায় গন্‌শার বাড়ি—অঙ্ক কষতে।

গাঙ্গুলী মশাই আর চৌধুরী মশায়ের দৃষ্টি ধীরে ধীরে ছেলে দুটির ওপর পড়ল।

—বাঃ! এরা ত বেশ! খেলায়ও ভালো, আর পড়াতেও পেছপা নয়।

গরম খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন ভাজা থাকবেই।

আস্তে আস্তে গাঙ্গুলী মশায়ের সঙ্গে চৌধুরী মশায়েরও আলাপ হল। সেই আলাপ ক্রমে ঘনীভূত হয়ে উঠল। বড় মাছ কিনলে গাঙ্গুলী মশাই চৌধুরী মশায়কে ভাগ নিতে বলেন। আবার বেশী দুধ কিনলে চৌধুরী মশায়ের বাড়ি থেকে গাঙ্গুলী মশায়ের গৃহে পায়েসের বাটি যায়।

দুই বাড়ির লোকে বলে,—ভাগ্যিস্ গরম খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন ভাজার ভাব হয়েছিল!

বাটি চলাচলি থেকেই মন মেশামেশি। গাঙ্গুলী গিন্নী এখন চৌধুরী গিন্নীর সঙ্গে পরামর্শ না করে এক পা এগোন না। আর চৌধুরী গিন্নী ঘুম থেকে উঠেই গরম চা করে ভরতি পট্ গাঙ্গুলী গিন্নীর কাছে পাঠিয়ে দেন। খালি পাত্র ফেরত আসে না। সেই সঙ্গে গাঙ্গুলী বাড়ি থেকে আসে গরম চিঁড়ে ভাজা আর নারকোল কোরা।

ফলে হয়েছে কি—দুই বাড়ির চাকরদের কাজ বেড়ে গেছে। গাঙ্গুলী বাড়ির পীতাম্বর আর চৌধুরী বাড়ির জনার্দন শুধু মাকুর মতো একবার এ-বাড়ি, একবার ও-বাড়ি করছে।

ওরা রসিকতা করে বলে,—এইবার পায়ের দড়ি ছিঁড়ে না যায়!

গাঙ্গুলী মশাই ছেলেদের বিদ্যালয়েই সহকারী প্রধান শিক্ষক। ছেলেরা তাঁকে মানেও খুব। গাঙ্গুলী মশাই ইস্কুলে যে রায় দেবেন সেইটেই ছাত্রদের কাছে একেবারে বেদবাক্য। সম্মানে আর শ্রদ্ধায় সবাই তাঁকে এমন একটি উঁচু আসনে তুলে ধরেছে যে, মনের সন্তোষে তিনি সবাইকার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিপাত করতে পারেন।

চৌধুরী মশায়ের খাতির আবার পাড়ায় বেশী। কারণ তিনি নামকরা চিকিৎসক। পাড়ার লোকে বলে, চৌধুরী ডাক্তারের এক পুরিয়া ওষুধ খেলে ছেলেমেয়েদের অসুখ পালাতে পথ পায় না!

সমাজে আর পাড়ায় গাঙ্গুলী মশাই আর চৌধুরী মশাই সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র। শিক্ষাবিদের সঙ্গে মিলন ঘটেছে চিকিৎসকের। একজন ছেলেদের মনের কালো দূর করে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, আর একজন ছোটদের দেহের ব্যাধি দূর করে শরীরকে রোগমুক্ত করে তোলেন। দুইজনের মনের মিল হওয়ায় এখন মাঝে মাঝে সন্ধ্যায় আলোচনা সভা বসে। কখনো গাঙ্গুলী মশায়ের বৈঠকখানায়, কখনো বা চৌধুরী মশায়ের ডিসপেনসারীতে।

ছেলেমেয়েদের সকল রকমে মানুষ করে গড়ে তোলার সব রকম কথাবার্তাই হয়।

বৈঠকখানার আসর যত গরম হয়ে ওঠে অন্দরমহলের রান্নাঘর থেকে তত বেশী গরম খাবার আসতে শুরু করে। গাঙ্গুলী গিন্নী আর চৌধুরী গিন্নী যেন পাল্লা দিয়ে খাবার তৈরি করায় মনোনিবেশ করেন।

ফলে পীতাম্বর আর জনার্দনের মুখ কেবলি শুকিয়ে ওঠে।

শুধু যে খাবার নিয়েই এবাড়ি-ওবাড়ি ছুটোছুটি করতে হয় তাই নয়, নানাদিক দিয়েই দুই বাড়ির ভৃত্যের নৃত্যপর্ব বেড়ে গেছে! গাঙ্গুলী গিন্নীর বোনের বাড়ি হয়ত চিঠি নিয়ে ছুটতে হবে—তখন ডাক পড়ে চৌধুরী বাড়ির জনার্দনের। আবার চৌধুরী বাড়ির জরুরী ধুতি-শাড়ি ডাইং ক্লিনিং থেকে আসেনি, তখন ডাক পড়ে গাঙ্গুলী বাড়ির পীতাম্বরের। এমনি ভাবে দিদিমনিদের লজেন্স-বিস্কুট কিনতে, ঠাকুমা-দিদিমাদের পান জর্দা আনতে, গিন্নীদের সিনেমায় পৌঁছে দিতে, বাবুদের ব্লেড, সাবান যোগাড় করতে পীতাম্বর আর জনার্দন একেবারে হিমশিম। তখন আর হিসেব ঠিক থাকে না—কে কোন্ বাড়ির বেতনভোগী ভৃত্য। দুই বাড়ির সবাই মনে করে যে কোনো একজনকে ফরমাশ করলেই হল।

শেষকালে একদিন পীতাম্বর আর জনার্দন পা ছড়িয়ে বসে বিচার করতে শুরু করল।

পীতাম্বর বললে, "ভাই রে জনার্দন, যখন চাকরিতে বহাল হয়েছিলাম তখন জানতাম শুধু গাঙ্গুলী বাড়ির কাজ করতে হবে। এখন দেখছি কাজ করতে হবে দুইবাড়ির আর মাইনে নেবার বেলায় একবাড়ির।"

জনার্দনও ডুকরে কেঁদে উঠল। বললে, "দাদা রে, দুঃখের কথা আর কারে শোনাই! তুমি ত দেখছি ব্যথার ব্যথী—তাই মনের কথা খুলে কই। চাকরি হল চৌধুরী বাড়ি। ভাবলাম, লোকজন কম, কর্তার আয় বেশী। ভালো-মন্দ খাবো আর নাক ডাকিয়ে ঘুমুবো। কিন্তু কি কুক্ষণে দুই বাড়ির দাদাবাবু খিচুড়ি আর বেগুন ভাজার জট পাকিয়ে ফেললে—তার ঠ্যালা সামলাতে আমরা বেচারীরা মারা যাই আর কি!"

জনার্দন যত কাঁদে পীতাম্বর তত তার চোখের জল মুছিয়ে দেয়।

পীতাম্বর বললে, "আর কাঁদিসনি ভাই জনার্দন, তোকে কাঁদতে দেখলে আমিও ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলবো।"

জনার্দন জিজ্ঞেস করলে, "তা হলে উপায় দাদা?"

পীতাম্বরের বয়েস বেশী, একটু ভারিক্কি মানুষ, হিসেব করে পথ চলতে পারে। তাই ভৃত্য-মহলে ওর খাতির আছে। অনেকেই সলা-পরামর্শ নিতে ওর কাছে আসে। তাই একটু ভেবে-চিন্তে সে বললে, "দেখ, একটা কাজ করতে হবে—"

জনার্দন উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন করলে, "কী কাজ—কী কাজ ? তুমি যা বলবে সেই কাজই আমি করবো।"

পীতাম্বর জবাব দিলে, "কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়। খিচুড়ি আর বেগুন ভাজার মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দিতে হবে।"

জনার্দন মাথা নেড়ে উত্তর দিলে, "উঁহু, সেটি হতে পারবে না। ও বড় শক্ত ঠাঁই। দাদাবাবুরা যেন কানাই-বলাই। হরিহর-আত্মাও বলতে পারো।"

পীতাম্বর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

—"তা হলে উপায় ? আমরা দুটি প্রাণী যে একেবারে প্রাণে মারা যাবো !"

জনার্দন হঠাৎ পুলকিত হয়ে ওঠে। বললে, "আমার মাথায় একটি চমৎকার বুদ্ধি এসেছে।"

পীতাম্বর শুধোয়, "বুদ্ধিটা কি শুনি ?"

জনার্দন জবাব দেয়, "দুই বাড়ির গিন্নীর মধ্যে মনকষাকষি করিয়ে দিতে হবে !"

পীতাম্বর হোহো করে হেসে ওঠে। বলে, "সে ত আরো কঠিন কর্ম রে বোকা ! এ-বাড়ির গিন্নী যদি পাঠায় লঙ্কার আচার ত ও-বাড়ির গিন্নী ভেট দেয় আমসত্ব। ওদের ভাবে চিড় লাগানো আরো শক্ত !"

জনার্দন কিন্তু মুচকি মুচকি হাসে। বলে, "ওই খাবারের ভেতর দিয়েই শনি ঠাকুরকে ঢুকিয়ে দিতে হবে। সেই যে শনি আর লক্ষ্মীর কোঁদল হয়েছিল, কে বড় ? আর তার জন্যেই শ্রীবৎস-চিন্তার রাজ্যি ছারেখারে গেল ! আসল কথাটা কি জানো দাদা, কেউ নিজের নিন্দে এতটুকু সইতে পারে না ! ওই পথেই আমাকে এগুতে হবে।"

পীতাম্বর উত্তর দিলে, "কী যে হেঁয়ালিতে কথা বলিস, আমি ঠিক বুঝতে পারিনে !"

জনার্দন তার হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বললে, "তোমায় কিচ্ছু ভাবতে হবে না দাদা। আমায় শুধু দুটো দিন সময় দাও—সব ওলটপালট করিয়ে দেবো। জয় বাবা শনি ঠাকুর, মুখ রেখো বাবা—"

সেই দিন সন্ধেবেলা চৌধুরী বাড়ির গিন্নী একবাটি ক্ষীরপুলি তৈরি করে গাঙ্গুলী বাড়ির গিন্নীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। জনার্দন মনে মনে স্থির করে ফেললে, এই থেকেই তার প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করবে।

কাজেই সে ইচ্ছে করে খানিকটা গড়িমসি করলে, এধার-ওধার ঘুরলে খানিকক্ষণ, পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পান খেয়ে বেশ কিছুটা সময় নষ্ট করলে। তারপর হেলতে-দুলতে চৌধুরী বাড়ির গিন্নীর সামনে এসে হাজির হল।

চৌধুরী গিন্নী জনার্দনের এত দেরি দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে ছিলেন। তিনি ওর দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে যেতেই জনার্দন হাত জোড় করে বললে, "মা-ঠাকরুন, এই

আমি নাক মলছি, আর এই আমি কান মলছি ; কিন্তু দোহাই আপনার, ওই গাঙ্গুলী বাড়ির গিন্নীর কাছে আমাকে আর পাঠাবেন না !"

চৌধুরী গিন্নীর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। শুধোলেন, "কেন রে জনার্দন, কী হয়েছে ?"

জনার্দন কাঁদো কাঁদো হয়ে জবাব দিলে, "মা-ঠাকরুন, আপনি এমন সুন্দর ক্ষীরপুলি পাঠালেন, আর গাঙ্গুলী গিন্নী তাই আঙুল দিয়ে টিপে বললেন, 'এমন রাস্তার খোয়ার মতো পুলি চৌধুরী গিন্নী না পাঠালেই পারত ! বাড়ির লোকের মুখে বুঝি রুচলো না, তাই আমাদের এখানে চালান করা হয়েছে' ।"

চৌধুরী গিন্নী বললেন, "তারপর ?"

জনার্দন আমতা-আমতা করে উত্তর দিলে, "তারপর গাঙ্গুলী গিন্নী এত সুন্দর ক্ষীরপুলিগুলো ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিলেন।"

চৌধুরী গিন্নী শুধু বললেন, "হুঁ !"

তারপর একটু চুপ করে থেকে হুকুম দিলেন, "আচ্ছা যা, তুই তোর কাজ করগে—"

জনার্দন বুঝতে পারলে ওষুধে কাজ ধরেছে। তখন সে আপনমনে বগল বাজিয়ে নিজের কুঠরিতে গিয়ে বিড়ি ফুঁকতে লাগলো।

পরদিন কিসের ছুটি ছিল। সকালে গাঙ্গুলী গিন্নী এক ঝুড়ি কড়াইশুঁটির কচুরি পীতাম্বরের হাতে দিয়ে চৌধুরী গিন্নীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

চৌধুরী গিন্নী চোখ উলটে বললেন, "ওই দড়িপাকানো শুকনো কচুরি বাপু, আমাদের বাড়িতে কেউ খাবে না। বাইরে ভিখিরীরা বসে আছে—তাদের বিলিয়ে দাও।"

কথাটায় আরো রঙ চড়িয়ে পীতাম্বর গাঙ্গুলী গিন্নীর কানে তুলে দিলে।

গিন্নীদের মুখ থেকে কথাগুলো উঠল কর্তাদের কানে।

তারপর দুই বাড়িতে থমথমে ভাব।

চৌধুরী মশাই ছেলে গদাকে ডেকে বললেন, এখন থেকে গাঙ্গুলী বাড়ির গন্‌শার সঙ্গে সে যেন না মেশে।

গাঙ্গুলী মশাই তাঁর ছেলে গন্‌শাকে সাবধান করে দিলেন, চৌধুরী বাড়ির গদার সঙ্গে সে যেন কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়।

দুই বন্ধু মুখ চুন করে ঘোরাঘুরি করে। ইস্কুলেও পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়, কিন্তু বাবার বারণ কি করে ওরা মিলবে, কি ভাবে ওরা টিফিনের ঘণ্টায় খাবার ভাগ করে খাবে ? কি করে আবার দুজনে নিরিবিলি বসে মনের কথা বলাবলি করবে ?

সামনেই পরীক্ষা আসছে। ওদের দুজনের কত প্ল্যান ছিল—একসঙ্গে বসে অঙ্ক কষবে, যুক্তি করে ট্রানস্লেশন করবে, আর পরস্পরে পরামর্শ করে রচনা লিখবে ! সব তাদের ভেস্তে গেল।

কি করে যে দুই বাড়ির মধ্যে ফাটল ধরল তা ওরা বুঝতে পারে না।

ইস্কুলের ছেলেরাও দেখে অবাক্ হয়ে গেল যে গদা আর গন্‌শার মধ্যে কোনো বাক্যালাপ নেই!

একটি ছেলে ডাকলে,—"হ্যাঁরে গরম খিচুড়ি"—আর একজন বন্ধু হাঁকলে,—"হ্যাঁরে বেগুন ভাজা—"

কিন্তু আগের মতো ওদের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ওরা দুজন দুদিকে চলে গেল!

দুই বাড়ির কর্তার বৈঠকখানার আসর আর জমে না। গরম গরম খাবার নিয়ে আর আগের দিনের মতো হুল্লোড় ওঠে না।

দুই বাড়ির গিন্নী মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যান। কেউ কড়া নাড়লে ভাবেন,—ও-বাড়ির চাকর বুঝি বাটি করে কিছু নিয়ে এলো।

কিন্তু ওঁরা দুজনেই হতাশ হয়ে পড়েন যখন দেখা যায় গয়লা, মুদি কিংবা ধোবা বাড়ির ভেতরে ঢুকছে!

গাঙ্গুলী গিন্নী হতাশ হয়ে জানালা দিয়ে দূরের দেবদারু গাছটার দিকে তাকান। আর চৌধুরী গিন্নী আকাশের দিকে চেয়ে—চিলের অতি দূরে ওড়া দেখেন!

কিন্তু পীতাম্বর আর জনার্দন ভারী খুশী।

জনার্দন বিড়ি টানতে টানতে বলে, "কী পীতাম্বরদা, আমার টোটকাটার কেমন গুণ দেখলে ত?"

পীতাম্বর জবাব দেয়, "তোর পেটে পেটে যে এত জিলিপির প্যাঁচ তা আমি কি করে জানবো বল?"

জনার্দন বলে, "হুঁ! এখন ত জিলিপির প্যাঁচ বলবেই, মরে যাচ্ছিলে খেটে খেটে···প্রাণে বাঁচিয়ে দিলাম কিনা!"

পীতাম্বর ও জনার্দন এইবার প্রাণের আনন্দে হোহো করে হেসে ওঠে!

সেই যে দুই বাড়ির থমথমে ভাব সেটা আরো গাঢ় হল যখন খবর পাওয়া গেল—গদা আর গণেশ কেউ পরীক্ষার ফল ভালো করেনি!

দুই বাড়ির কর্তা গিন্নী সচকিত হয়ে উঠলেন। কিন্তু কিছুই তাঁদের করবার ছিল না। যে মিতালির মালা তাঁরা নিজেরাই জোর করে ছিঁড়ে দিয়েছেন সেটা নতুন করে গাঁথা হবে কোন্ সুতোয়?

গদা আর গণেশ আপন মনে ইস্কুল ছাড়িয়ে নদীর ধারে বেড়ায়।

তাইত! পড়ায় মন না লাগলে পরীক্ষার ফল ভালো হবে কি করে? দুজনে

একসঙ্গে পরামর্শ করে পড়াশোনা করলে নিশ্চয়ই পরীক্ষার খাতায় অনেক নম্বর পাওয়া যেত !

আর সেই আনন্দের হুল্লোড় নেই ! দুই বাড়ির চাকরের খাবারের বাটি নিয়ে ছুটোছুটি নেই, পড়তে পড়তে ছেলেদের হট্টগোল নেই, বৈঠকখানা থেকে সে অট্টহাস্য আর ভেসে আসে না ! সব যেন কেমন মিইয়ে ঝিমিয়ে গেছে।

একটা কালো বেড়াল শুধু চৌধুরী বাড়ির হেঁসেল থেকে গাঙ্গুলী বাড়ির হেঁসেল পর্যন্ত কেঁদে বেড়ায় !

কিন্তু পীতাম্বর আর জনার্দনের দুই জোড়া কুতকুতে চোখ আনন্দে নৃত্য করতে থাকে।

একটা নিস্তরঙ্গ পুকুরের মতো দুই বাড়ির দিনগুলি উদাসীন বাউলের সুরের মতো দিগন্তে ভেসে যাচ্ছিল।

এমনি সময় সাড়া জাগল সারা অঞ্চলে। চৌধুরী বাড়ির একটি মেয়ে পুকুরে পা পিছলে পড়ে গেছে। পুকুরের চারধারে লোকের ভিড়, কিন্তু কেউ এগিয়ে এসে মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে না। পাড়ে বয়স্কা মহিলা যারা ছিল সবাই হায় হায় করতে লাগল।

এমন সময়—

কোত্থেকে ছুটে এলো গাঙ্গুলী বাড়ির ডানপিটে ছেলে গণেশ। সে মালকোঁচা মেরে একেবারে পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ততক্ষণে মেয়েটা অনেক জল খেয়েছে—

কিন্তু গণেশ প্রাথমিক চিকিৎসাটা এর আগেই ভালো করে শিখে নিয়েছিল। তাই ক্রমাগত শুইয়ে-বসিয়ে পেট থেকে সব জল অতি সহজেই বের করে দিলে।

মেয়েটা এইবার ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো। সারা পাড়ার লোক গণেশকে ধন্য ধন্য করতে লাগল। ছেলেরা চীৎকার দিয়ে উঠল—

"গরম খিচুড়ি, বেগুন ভাজা জিন্দাবাদ !"

সেইদিন রাত্রে চৌধুরী গিন্নী গিয়ে গাঙ্গুলী গিন্নীর দুই হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, "দিদি, তুমি আমায় ক্ষমা করো—"

গাঙ্গুলী গিন্নী বললেন, "না—না, সব দোষ আমার—"

চৌধুরী গিন্নী বললেন, "তা হলে আগের মতোই রাস্তার খোয়ার মতো ক্ষীরপুলি পাঠাবো ?"

শুনে চমকে উঠলেন গাঙ্গুলী গিন্নী। শুধোলেন, "আচ্ছা, সত্যি করে বল ত বোন, একথা কে বলেছে?"

তারপর ধীরে ধীরে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ল।

তখন গাঙ্গুলী গিন্নী আর চৌধুরী গিন্নী একসঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠলেন,—"ডাক্ পীতাম্বর আর জনার্দনকে—"

ওদিকে জনার্দন পীতাম্বরের কানে-কানে বললে, "দাদা, এইবার এখান থেকে আমাদের অন্ন উঠল। যা কিছু সরিয়েছ পুঁটলিতে বেশ করে গেরো গিয়ে বেঁধে ফেল! তারপর চলো, পথে বেরিয়ে পড়ি—"

গাঁয়ের ডাক

শ্রীজয়ন্তকুমার পাঠক

আজও আমার মন যে সেথা ছুটে,
সেই যে দূরের গেঁয়ো-পথের পানে,
দুপাশে তার শাপলা-পদ্ম ফুটে
লুটোপুটি খাচ্ছে হাসির তানে!

বিলের জলে চাষী ছেলেমেয়ে
নানান মাছ ধরছে দামের ফাঁকে;
পাঁচন হাতে আসছে রাখাল ধেয়ে
গরুর-পাল ল'য়ে নদীর বাঁকে।

আলের পথে সবুজ-ক্ষেতের মাঝে
মাথাল মাথে যায় চাষী গান গে'য়ে;
যায় তাহারা যে যার ক্ষেতের কাজে;
কেউ বা যায় শালতিডোঙ্গা বেয়ে।

নেড়া-বাবলার শুকনো ডালের 'পরে
শঙ্খ চিল বসল উড়ে আসি;
বাঁশের সাঁকোর 'পরে হর্ষভরে
গাঁয়ের ছেলে বাজায় পাতার বাঁশি।

একফালি ঐ উঁচু জমির বুকে
লাঠি পুঁতে ডগায় বেঁধে ছাতি—
তলে শিশু শুইয়ে মনের সুখে
কৃষাণ-বৌ উঠল কাজে মাতি।

ভাবছি মনে শহর থেকে দূরে—
যাই ছুটে সেই শান্ত গাঁয়ের বুকে;
স্নিগ্ধ-শ্যামল মাঠের বুক জুড়ে
লুকোচুরি খেলি মনের সুখে।

টারজানের উনপঞ্চাশতম অ্যাড্‌ভেঞ্চার

লেখক
সব্যসাচী

সারা রাত কামাথুন শহরে কারো চোখে ঘুম নেই। ডাইন-পুরোহিতরা চড়া গলায় মন্তর পড়ছে সিংহভোজের আসরের চারদিক ঘুরে ঘুরে। দূরে দূরে বনে বনে সিংহের ডাক শোনা যায়, তারা সব জানান দিচ্ছে—'তৈরী আছি আমরা, রাতটা ভোর হলেই চলে আসব ভোজ খেতে।'

আজ আর টারজানের গাছের ডালে রাত্রিযাপনের দরকার হয়নি। বাস্তুটো রাজা মুজাম্বাই তাকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়েছে। খানাপিনা আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি, চামড়ার উপর চামড়া বিছিয়ে এক হাত পুরু বিছানাও তাকে করে দেওয়া হয়েছে। অনেক রাতে অতিথির কাছে বিদায় নিয়ে মুজাম্বা শয়ন করতে গিয়েছে নিজের মহলে।

বড় একখানা ঘরে টারজান একেবারে একা। মনটা খুঁতখুত করছে কেমন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানানভাবে মুজাম্বা জানতে চাইছিল—ডাইনদের ঝিনুকমালা সে বাগাল কেমন করে। সে ত এদেশের লোক নয়! ডাইনদের ভিতর দেশদ্রোহী কেউ না থাকলে ত এ-মালা তার হস্তগত হওয়ার কথা নয়!

'হ্যাঁ, না' কোন জবাবই দেয়নি টারজান। ভদ্রভাবে এড়িয়ে গিয়েছে প্রশ্নের জবাব। নিজের প্রজাদের ভিতর কেউ এভাবে জবাব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে মুজাম্বা তক্ষুনি তার গায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে জবাব আদায় করে নিত; কিন্তু টারজানের বেলায় সে-রকম কিছু করতে সে সাহস পায়নি। একে লোকটা রাজবংশীয়, তায় দেহেও তার অসুরের মত শক্তি আছে মনে হয়। তার উপর আবার সন্দেহ হচ্ছে যে ডাইনেরা কেউ কেউ গোপনে তার পক্ষে আছে। এমন লোককে সহসা ঘাঁটানো বুদ্ধির কাজ হবে না। রাজার চাইতে ডাইনের প্রতাপ বেশী কালোদের দেশে। অনেক সময় রাজাকে তারা সিংহাসন থেকে টেনে নামায়, আবার সিংহাসনে বসায় এমন লোককে, যার সেখানে বসবার কোন দাবিই নেই। কে জানে, এই ওয়াজিরি রাজপুত্তুরকে এদেশে ডেকে আনার পিছনে ডাইনদের সেইরকম কোন মতলব আছে কিনা! আর ওরা যদি ডেকেই না আনবে, তাহলে টারজান ঢোকে কেমন করে বাস্তুটো দেশে?

টারজান জানে—কোন প্রশ্নের জবাব না পেয়ে মুজাম্বার মনের সন্দেহ আরও দানা বেঁধে উঠেছে। হয়ত সে অতিথিকে শত্রু বলে ভাবছে এখনই। তা যদি হয়—টারজানের এখনো ঘুমোবার সময় আসেনি। ঘুমিয়ে পড়লে সে-ঘুম হয়ত আর ভাঙবে না কোনদিন।

অন্ধকারের ভিতরই টারজান বিছানা থেকে নেমে পড়ল। খানকতক হরিণের চামড়া

বিছানা থেকে তুলে নিয়ে গোল করে পাকাল। তারপর লম্বালম্বি বিছানার উপর সেটাকে শুইয়ে দিয়ে আর একখানা চামড়া ঢাকা দিল তার উপরে। তারপর নিজে উঠে বসে রইল ঘরের কড়িকাঠের উপর। এসব ঘর বড় নতুন-রকমের। পাথরের দেওয়াল বটে, চাল কিন্তু গাছের পাতার। ঘরের মাঝখানে একটিমাত্র কাঠের খুঁটি, তার মাথা থেকে চারদিকে অনেকগুলো কড়িকাঠ বেরিয়ে গিয়েছে দেওয়ালের মাথা পর্যন্ত। সেইসব কড়ির উপর বসানো বাঁশের খাটো খাটো খুঁটি, তাদেরই মাথায় পাতার চাল।

দরজার ঝাঁপ বন্ধ করবার কোন ব্যবস্থা নেই, না ভিতর দিকে, না বাইরের দিকে।

টারজান টের পেল, অতি ধীরে ধীরে বাইরে থেকে কেউ ঝাঁপ ঠেলছে। সে দম বন্ধ করে বসে রইল—যাতে নিশীথ রাতের আগন্তুকেরা নিশ্বাসটুকুও তার শুনতে না পায়।

কেউ একজন ঢুকছে ঘরে। দরজা ঈষৎ ফাঁক করে তারই ভিতর দিয়ে গলে কেউ নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকছে। মানুষের নিঃশব্দ চলা আর জানোয়ারের নিঃশব্দ চলা—এ দুটোতে তফাত আছে অনেক। অন্ততঃ টারজান সে-তফাত ধরতে পারে, কারণ সারা জীবন সে নিশাচর জন্তুর পায়ের শব্দ শুনে আসছে।

যে ঢুকেছে, সে মানুষ নয়, জন্তু।

ঠিক! দুটো জ্বলজ্বলে চোখ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ও চোখ কিসের হতে পারে? সিংহের? না, সিংহভোজের আগের রাতে কোন সিংহ এভাবে চোরের মতন কারও ঘরে ঢুকবে না। আজ তাদের রাজকীয় মেজাজ, দেবতার পর্যায়ে আজ তারা উঠে বসে আছে। মুজাম্বার খাতিরেও কোন পালিত সিংহ আজ ঘুমন্ত মানুষের উপর আক্রমণ চালাবে না।

তবে কী এ? চিতা?

খুব সম্ভব তা-ই। এরকম চোরের মত নিঃশব্দ চলাফেরাতে চিতারাই ওস্তাদ। কিন্তু মুজাম্বার রাজপুরীতে চিতা ঢোকে কেমন করে? পোষা চিতা হলে সে শিকলে বাঁধা বা খাঁচায় আটক থাকত। নিশীথ রাতে পোষা জানোয়ার অতিথির ঘরে ঢুকছে, এটা সম্ভব হতে পারে শুধু যদি এর পিছনে মুজাম্বার হাত থেকে থাকে।

কিন্তু চিন্তার সময় এটা নয়। জানোয়ারটা বিছানার কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। তার পায়ের শব্দ অন্য মানুষের শোনার মত না হলেও টারজান তা শুনতে পাচ্ছে। একটু পরেই সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বিছানার উপরে দুই পা তুলে দিয়ে জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলছে চিতাটা। তারপরেই একটা চাপা গজরানি, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা হতাশার চীৎকার। গোল করে পাকানো চামড়ার গাদায় কামড় বসিয়ে বোকা বনে গিয়েছে সে।

টারজান শুধু বসে বসে মজা দেখছে না, ভাবছেও। ভাবছে—এ ঘরে আর অপেক্ষা করা

উচিত হবে না তার। চিতার চীৎকার শুনে মুজাম্বার লোকেরা এসে পড়তে পারে, স্বয়ং মুজাম্বার আগমনও অসম্ভব নয়। মুজাম্বা তাকে হত্যা করবার জন্যেই চিতা পাঠিয়েছে নিশ্চয়। এসে যদি সে দেখে যে টারজান মরেনি, তাহলে মরিয়া হয়ে সে নিজেই আক্রমণ করতে পারে। ঘরের ভিতর দশ বিশজনে মিলে তার উপর চড়াও হয় যদি, তবে তার রক্ষা পাওয়া কঠিন। অতএব সময় থাকতে পালানোই উচিত।

দরজা দিয়ে পালানোর উপায় নেই, বাধা দেবে চিতাটা। তা ছাড়া, লোকজন যদি আসতে থাকে, দরজার ওপিঠেই তাদের মুখোমুখি পড়ে যেতে হবে। কাজ কি অত ঝঞ্ঝাটে! এই ঘরের পাতার চাল ফুটো করে বেরিয়ে পড়া খুবই সহজ। কাল সন্ধ্যাবেলাই টারজান লক্ষ্য করেছে—চালের ঠিক উপরে একটা বড়গাছ আছে, আর সেই গাছের বড় একখানা ডাল বেয়ে খানিকটা গেলেই রাজবাড়ির পাথরের পাঁচিলে পৌছানো যায়।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা হতাশার চীৎকার। [পৃষ্ঠা ১০৬

কড়ির উপর দাঁড়িয়ে টারজান চাল ফুটো করছে, সাড়া পেয়ে চিতাটা দিল উপর্যপানে লাফ। ঠিক এইটাই প্রত্যাশা করছিল টারজান, এবং তৈরীও ছিল। প্রথম লাফে কড়ি ধরতে পারল না চিতাটা, পড়ে গেল নীচে; কিন্তু পড়বার আগেই তার গলায় ছোরার মোক্ষম এক আঘাত বসিয়ে দিয়েছে তার শত্রু। যাতনায় আর্তনাদ করে সে আবারও লাফ দিল বটে, কিন্তু ততক্ষণে টারজান চালের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে উপরের গাছে চড়ে বসেছে।

এদিকে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়েছে মুজাম্বা আর তার অনুচরেরা। বর্শা বল্লম তাদের প্রত্যেকের হাতে, অনেকের বাঁ হাতে মশাল। টারজান নেই এবং রাজবাড়ির সেরা চিতাবাঘটা সাংঘাতিক আহত হয়ে পড়ে আছে দেখে তারা যেমন অবাক্ হল, তেমনি হল ক্রুদ্ধ। কোন্ পথে দুশমন পালিয়েছে, তা বুঝতে দেরি হল না তাদের, কারণ চালে ফুটো রয়েছে, পূর্ণিমার চাঁদের আলো এসে ঘরের ভিতর পড়েছে সেখান দিয়ে।

সেই রাতেই গাছে চড়ে ওরা অনেক খোঁজাখুঁজি করল টারজানের, কিন্তু কোথায় পাবে তাকে? সে তখন গাছের ডাল বেয়ে পাঁচিল টপকে লম্বা পা চালিয়েছে সিংহভোজের আসরের দিকে। সেখানে অত রাত্রেও আলো জ্বলছে অনেকগুলো, জায়টুঙ্গি আর অন্য সর্দারেরা লোকজন নিয়ে তখনো কাজে ব্যস্ত, আসর সাজানো শেষ হয়নি তখনো।

টারজানের লক্ষ্য জায়টুঙ্গি। চিতাবাঘের ঘটনা তাকে জানিয়ে দিয়ে এখনকার কর্তব্য সম্বন্ধে তার সঙ্গে একটা পরামর্শ করা চাই। কিন্তু জায়টুঙ্গির কাছে পৌঁছোবার আগেই ঝোপের আড়াল থেকে একটা লোক এসে তার পথের উপর দাঁড়াল।

"ওয়াজিরি রাজা টারজান, সাদা গায়ে কালো রং মাখা সোজা, কিন্তু বড় ডাইনের চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। সে-চোখ সবকিছু লুকানো জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়।"

বড় ডাইন? বাসুটো দেশের ডাইন-পুরোহিতদের প্রধান এই লোকটা। গলায় একবোঝা নানা রঙের পাথরের মালা আর মাথায় জটার উপর নানা রঙের পালক দেখে একটা কেউ-কেটা বলে একে সত্যিই মনে হয় বটে।

টারজান কী উত্তর দেবে ভাবছে, এমন সময় ডাইন হেসে উঠল—"তুমি ওয়াজিরিদের রাজা, কাজেই আমাদের শত্রু। কিন্তু আপাততঃ আমরা তোমাকে বন্ধুভাবে পেতে চাই। মুজাম্বা কাল সাতাশটা সর্দারের সমুখে ডাইনদের বেইমান বললে—শুনেছ ত? ওর আগে অন্য কোন রাজা এমনভাবে আমাদের অপমান করতে সাহস করেনি। আর এরকম অপমান ও মাঝে মাঝেই আমাদের করে। তার সাজাও দেবতারা ওকে দিচ্ছেন। ওয়াজিরিদের হাতে এই যে পরাজয়টা হল, দেবতারা খুশী থাকলে কি হতে পারত?"

"আমায় কী করতে বলছেন আপনি?"—প্রশ্ন করে টারজান।

"যা না করলে হেনরি নামক টারমাঙ্গানিকে তুমি কিছুতেই টোটেম ঠাকুরদের হাত থেকে কাল রক্ষা করতে পারবে না। মুজাম্বাকে—"

তারপর ফিসফিস করে অনেক কথা হল দুজনে।

ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সিংহভোজের আসর ভরে উঠতে লাগল। মই বেয়ে উঠছে মানুষেরা, আর দরজা দিয়ে ঢুকছে সিংহেরা। কালো কালো সিংহদের সে এক লম্বা মিছিল। সিংহ আছে, সিংহী আছে, সিংহশাবকও আছে। ঘন ঘন গর্জনে মাটি কেঁপে কেঁপে ওঠে, আসরের মাঝখানে বসে ভোজের প্রতীক্ষা করছে তারা। রোদ্দুরে চকচক করছে কালো অঙ্গ, জ্বলজ্বল করছে লাল চক্ষু। প্রত্যেকের গলায় ঝিনুকের মালা, সাদা মালা কালো গলায় মানিয়েছে ভাল। যাদের মালা নেই এমন সিংহও এসেছে, তবে তারা ঠাঁই পাচ্ছে আসরের ঘেরার বাইরে। সেদিকে জনমনিষ্যির আজ যাওয়া নিষেধ, গেলে সিংহেরা যদি কাউকে ধরে খায়, সেজন্যে ডাইনেরা দায়ী হবে না।

ঝিনুকের মালা মাচার উপরকার মানুষগুলোরও গলায়। যার যেমন মান, তেমনি আসনে সে বসেছে। মাঝখানে রাজা, তার ডাইনে বাঁয়ে বড় বড় সর্দার আর সৈনিকেরা, দূরে দূরে ছোট-খাটো লোক—সৈনিকও আছে, সাধারণ নাগরিকও আছে। ডাইন যাদের উপর খুশী, তারাই মালা পেয়েছে, তারাই মাচার উপর বসবার অধিকারী।

কালই মুজাম্বা বলেছেন—টারজানের আসন নির্দিষ্ট হবে রাজার আসনের পাশেই, কারণ সেও রাজবংশীয়। সেই আদেশ অনুসারেই জায়টুঙ্গি এসে টারজানকে রাজাসনের পাশে বসিয়ে দিল। চুপিচুপি বলল—"রাজা কিন্তু ক্ষেপে যাবে তোমাকে দেখলে। কাল কী আদেশ দিয়েছে, তা আজ তার মনে নেই; থাকলে তোমার জন্যে অন্য আসনের ব্যবস্থা করতে বলত। সে যাই হোক, তুমি কিন্তু হুঁশিয়ার থেকো। যে-ব্যবস্থা তুমি আমি আর বড় ডাইনে মিলে করেছি, তার প্রায় সবটারই ঝক্কি তোমার উপরে। তুমি যদি ঠিকমত চলতে না পার, সব ভেস্তে যাবে। তোমার হেনরিও বাঁচবে না, আমারও রাজা হওয়া ঘটবে না।"

যুদ্ধের ঢাক বাজতে শুরু হল এইবার, মই বেয়ে মাচায় উঠে এল মুজাম্বা আর তার বন্ধুরা। টারজান হাসিমুখে এগিয়ে গিয়ে সম্মান জানাল রাজাকে—"সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি একটু সকাল সকালই আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম, আপনাকে বলে আসা হয়নি। আশা করি আপনি রাগ করেননি সেজন্যে।"

মুজাম্বা কাষ্ঠহাসি হাসল একটুখানি, মুখে বলল না কিছুই।

নীচে সিংহেরা একসাথে গজরাতে শুরু করল। তাদের ভোজ এসে গিয়েছে। আসরের এক কোণে একটা ছোট্ট সরু দরজা এতক্ষণ বন্ধ ছিল, সেইটে খুলে উপরপানে টেনে তোলা হল ধীরে ধীরে। সেই দরজার পিছনে কালো কালো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে লম্বা লাইনে। লাইনের ওমাথা থেকে ডাইনের লোকেরা দারুণভাবে ঠেলতে লাগল এই অভাগাদের। আশেপাশে সরবার এতটুকু জায়গা নেই, লম্বা লাইনটা অনিবার্যভাবেই এগুতে লাগল ধাক্কা খেতে খেতে। এগুতে লাগল আসরের ভিতর পানে, যেখানে উবু হয়ে একশো আটটা কালো সিংহ লাইন করে বসে আছে ভোজ খাওয়ার জন্যে।

কালো সিংহ, কালো মানুষ। সিংহদের গলায় ঝিনুকমালা, মানুষদের গলায় কিছু নেই। সিংহদের আছে দাঁত আর নখ, মানুষদের হাতিয়ার নেই। তবু একটা ক্ষীণ আশা এই মানুষগুলোকে দেওয়া হয়েছে। কেউ যদি সিংহের গলা থেকে মালা কেড়ে নিয়ে নিজে পরে ফেলতে পারে, তবে সে বেঁচে যাবে। ডাইনদের এমনি মন্তরের জোর যে মালাওয়ালা কোন মানুষকে কোন সিংহ আক্রমণ করবে না; আর মালাহীন সিংহ আপনা থেকেই আসর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে রবাহূত সিংহদের মাঝে আসন নেবে।

টারজান এসব কথাকে আজগবী বলেই মনে করেছিল, কিন্তু জায়টুঙ্গি তাকে বাধ্য করেছে বিশ্বাস করতে। এত জোর দিয়ে সে বক্তৃতা করেছে, আর এত দৃষ্টান্তের কথা তাকে শুনিয়েছে যে টারজানেরও শেষকালে মনে হয়েছে—'হতেও পারে হয়তো বা! পৃথিবীতে কত আশ্চর্য ব্যাপারই ত দেখা যায়! সব জিনিসেরই কি মানে বোঝা যায়?'

ঠেলা খেতে খেতে মানুষগুলো এসে ছিটকে পড়ছে আর্তনাদ করে। ছিটকে পড়ছে

সিংহদের থেকে সামান্য দূরে। এক একটা করে মানুষ এসে পড়ছে, আর একটা করে সিংহ দিচ্ছে লাফ। বেড়ালে যেমন করে বেড়ালছানাকে ঘাড় কামড়ে ধরে সিংহটা তেমনি ধরছে মানুষটাকে। তারপর আর এক লাফে ফিরে আসছে নিজের জায়গায়। আরাম করে বসে তার বুক বা পিঠ থেকে খাবলা খাবলা মাংস ছিঁড়ে নিয়ে পরিপাটি করে চিবুচ্ছে।

ওদিকে ততক্ষণ আর একটা মানুষ আসরের ভিতরে এসে পড়েছে, লাফ দিয়েছে আর একটা সিংহ, ঘাড়ে কামড়ে ধরে তাকে এনে ফেলেছে ভোজের লাইনে। একটা নারকীয় কাণ্ড! সিংহ যাদের খাবলে খাচ্ছে—তাদের গোঙানি, যারা ধাক্কা খেয়ে সিংহের মুখে পড়তে যাচ্ছে—তাদের হতাশ আর্তনাদ, সিংহদের কারও নিচুগলায় গজরানি, কারও আকাশ-ফাটানো গর্জন, আসরের মাটিতে রক্তের স্রোত, উপরের মাচায় নৃশংস মানুষগুলোর পৈশাচিক উল্লাস—সবে মিলে টারজানের মত লোহার মানুষকেও যেন দুর্বল করে ফেলল। এক একবার চোখ মেলে তাকায়, তারপরই চোখ তার আপনা থেকে বুজে আসতে চায়। সে যোদ্ধা, যুদ্ধ করে মারতে বা মরতে সে আনন্দ পায়। অসহায় অস্ত্রহীন লোককে সিংহের মুখে ফেলে দিয়ে আনন্দ করার ভিতর সে কোন যুক্তি দেখতে পেল না। এক একবার তার ইচ্ছে হতে লাগল—জায়টুঙ্গিদের সাথে যে-পরামর্শ তার হয়েছে, এক্ষুনি এই মুহূর্তে সেই অনুসারে সে কাজ শুরু করে দেয়। কিন্তু মনের সে আবেগকে জোর করে সে দমিয়ে রাখল। উপযুক্ত সময় না হলে কাজ শুরু করা যাবে না, তাতে হেনরির জীবন রক্ষা পাবে না। একা টারজানের উপরে সাফল্য নির্ভর করছে না এ-ব্যাপারে। জায়টুঙ্গির সাহায্য দরকার হবে, বড় ডাইনকে সময় দিতে হবে তার দলবলকে তৈরি করবার জন্যে।

টারজানের পরনে জায়টুঙ্গির দেওয়া বাসুটো পোশাক, হাতে জায়টুঙ্গির দেওয়া বল্লম। কিন্তু বল্লমের উপর কোন ভরসা টারজান রাখে না। কোমরে চিরদিনের সাথী পৈতৃক ছোরা তাকে যেন নীরব ভাষায় সাহস দিচ্ছে—"ভয় কি বন্ধু, সিংহের লড়াইয়ে চিরদিন আমি তোমাকে রক্ষা করেছি, আজও করব।" কিন্তু কী করে যে করবে, টারজান তা এখনো বুঝতে পারছে না। সিংহ আজ একটা নয়, একশো আটটা।

উপরে হৈহৈ হুল্লোড় একশো লোকের, নীচে সিংহের হুংকার আর মানুষের কান্না। কানে তালা লেগে যাওয়ার যোগাড়। রক্তে কাদা হয়ে গিয়েছে আসরের মাটি, মানুষের মুণ্ড গড়িয়ে বেড়াচ্ছে সেই মাটিতে। এখানে আধ-খাওয়া ধড়ের একটুকরো, ওখানে একটা হাত বা আধখানা পা। সিংহেরা সবাই তাদের খাবার পেয়েছে। লাইনের অতগুলো কালোর মধ্যে মাত্র দশ বারোটা এখন বাকী। এদের টেনে নিয়ে বাইরের রবাহূত সিংহদের সমুখে ফেলে দেওয়া হল। তারা এতক্ষণ মোষ গরু ছাগল ভেড়া খেয়ে ক্ষুধা মেটাচ্ছিল, মানুষ পেয়ে সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপর। কারও ভাগে একটুকরো মিলল, কারও ভাগে মিলল না।

এইবারে ঢাক বেজে উঠল জোরে জোরে।

কোণের সরু দরজাটা বন্ধ হয়েছিল একবারটি, এইবার আস্তে আস্তে আবার উপরে উঠতে লাগল, টারজানের বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। এল তার কাজ করবার মুহূর্ত। খোলা দরজার মুখে প্যান্ট-পরা একটা মাত্র সাদা মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ; মুখখানা তার রক্তহীন ফ্যাকাশে, কিন্তু সে-মুখে কান্নাও নেই, কাতরানিও নেই। পাদ্রীর ভাই হেনরি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে দীনতা প্রকাশ করবে না, সাদা জাতির নাম হাসাবে না।

সিংহেরা তখন রক্ত-মাংসে উদর পূর্ণ করে বসে আছে। কেউ চক্ষু বুজে হাড় চিবুচ্ছে দাঁতের সুখ করবার জন্যে, কেউ-বা জিভ দিয়ে মুখের আর থাবার রক্ত চেটেপুটে পরিষ্কার করছে। অনেকে হেনরির দিকে চোখ তুলে চাইলই না, কেউ-কেউ তাকাল বটে, কিন্তু হাই তুলে জানিয়ে দিল যে আপাততঃ তাদের আর নরমাংসে রুচি নেই।

একটা করে সিংহ দিচ্ছে লাফ। [পৃষ্ঠা ১১০

এরকম অবস্থায় সিংহদের ক্ষেপিয়ে তোলার উপায় হচ্ছে—উপর থেকে তাদের উপর ঢিল ছোঁড়া। পথ দেখাল মুজাম্বা নিজে। তার আসনের পিছনে আগে থেকেই পাথরের নুড়ি মজুদ করা ছিল, তাই তুলে নিয়ে সে মারতে লাগল সিংহদের মাথা লক্ষ্য করে। ঢিল খেয়ে এক একটা সিংহ গর্জে ওঠে আর রক্তচক্ষুতে হেনরির পানে চায়। তাদের সন্দেহ—সামনের ঐ লোকটাই বুঝি ঢিল ছুঁড়েছে।

ক্রমে মুজাম্বার পারিষদেরাও দুটো চারটা করে ঢিল ছুঁড়তে লাগল। প্রায় সব সিংহই ক্ষেপে উঠল, উঠে দাঁড়াল প্রায় সবগুলোই কেশর ফুলিয়ে, লেজগুলো আছড়াতে লাগল ডাইনে বাঁয়ে, পিছনের দুই ঊরুর উপর।

এইবার হঠাৎই কোন একটা সিংহ লাফ দিয়ে পড়বে অভাগা সাদা মানুষটার উপরে।

টারজান উঠে দাঁড়াল।

মুজাম্বা ঠাট্টা করে বলল—"তুমিও ঢিল ছুঁড়বে বুঝি? এখন আর দরকার নেই; বড্ডো দেরিতে এলে তুমি—।"

"তবু একটা ছুঁড়ি"—বলে টারজান মুজাম্বার পিছন দিকে গিয়ে দুই হাতে দুটো পাথর তুলে নিল।

ঠিক সেই সময় আসরের ভিতর একটা সিংহ লাফ দিচ্ছে। তার রক্তচক্ষু হেনরির উপর নিবদ্ধ করে সমস্ত শরীরটা টান-টান করে পিছন দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এইবার একটি লাফে হাওয়ার বুক চিরে ছুটে যাবে বিদ্যুতের মত, আর হেনরির লুটিয়ে-পড়া দেহের উপর পড়ে—

মাচার উপর একশো লোক চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে আছে এই বীভৎস দৃশ্য পুরোপুরি উপভোগ করবার জন্যে। হঠাৎ তাদেরই ভিতর থেকে উঠল একটা চীৎকার! চীৎকারের আধখানা! সবটা চীৎকার মুখ থেকে বার হবার আগেই মুজাম্বার দেহটা ডিগবাজি খেতে খেতে ছুটে গিয়ে পড়ল সেইখানে, যেখানে হেনরি দাঁড়িয়ে আছে সিংহের লাফ মাথা পেতে নেবার জন্যে। টারজান অতবড় পালোয়ানটাকে পাঁজাকোলা করে তুলে ছুঁড়ে দিয়েছে ঢিলের মত।

মুজাম্বাও পড়ল, সিংহও এসে পড়ল তার উপরে।

কিন্তু সিংহ তার উপরে পড়েই চোখের পলকে পিছিয়ে এল, রয়েছে মুজাম্বার গলায় ঝিনুকের মালা, সে-মালা যার গলায় থাকবে সিংহেরা তাকে ছোঁবে না।

মাচার উপর একশো মানুষ পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল, শুধু তাদের চোখগুলো যেন কপাল ছেড়ে ঠিকরে বেরুতে চাইছে। কী কারণে মুজাম্বা উপর থেকে নীচে পড়ে গেল, তার তদন্ত করবার জন্যে আশেপাশে তাকিয়ে দেখবার কথা কারও মনে হল না।

সিংহ মুজাম্বাকে ছোঁয় না, মুজাম্বা ধীরে ধীরে উঠে বসার চেষ্টা করছে। কিন্তু উঠে বসার সময় সে পেল না। আর একটা মানুষ উপর থেকে লাফিয়ে সোজা এসে নামল তার পিঠের উপর। এবারকার মানুষটা টারজান।

চোখের পলকের ভিতর ঘটে গেল এতখানি ব্যাপার। আর চোখের পলকেই মুজাম্বার গলা থেকে ঝিনুকমালা ছিঁড়ে নিয়ে টারজান সেটা হেনরির গলায় পরিয়ে দিল। তারপর প্রায়-অজ্ঞান হেনরিকে টেনে নিয়ে সে সরে গেল মুজাম্বার পাশ থেকে।

সিংহটা দেখল—তিনটে মানুষের ভিতর দুটোর গলায় মালা, একটার গলায় নেই; সেই একটার উপরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গর্জন করে। মুজাম্বার দেহ ছিঁড়ে সাতটুকরো করে ফেলল এক মুহূর্তের ভিতর।

এতক্ষণে উপরের মাচার লোকগুলোর যেন চৈতন্য ফিরে এল। তারা কেউ ক্রোধে গর্জন করে উঠল, কেউ অবাক্ হয়ে "এ কী হল, এ কী হল"—করতে লাগল। অনেকে বল্লম খুঁজতে লাগল নীচের আসরে টারজান আর হেনরিকে বিঁধে ফেলবার জন্যে।

কিন্তু আসরের কোণের সেই সরু দরজাটা হঠাৎই কেন যেন খুলে গেল আবার, আর সঙ্গে সঙ্গে হেনরিকে নিয়ে টারজান ঢুকে পড়ল তার ভিতরে। দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। এ সবই আগেকার বন্দোবস্ত। জায়টুঙ্গি তার কাজ ঠিকমতই করেছে।

সোজা এসে নামল তার পিঠের উপর। [পৃষ্ঠা ১১২

মুজাম্বার পারিষদেরা ঢাক পিটিয়ে সৈন্যদের সাজতে বলছে, বিশ্বাসঘাতক ওয়াজিরিটার মালা কেড়ে নিয়ে এক্ষুনি তাকে সিংহের সমুখে ফেলে দেবে বলে শাসাচ্ছে। সেই তুলকালাম হৈ-হল্লার ভিতর বাসুটো দেশের সবগুলি ডাইন তারস্বরে মন্তর আওড়াতে আওড়াতে মই বেয়ে মাচার উপর উঠে এল। বড় ডাইন বলল—"টোটেম ঠাকুরেরা মুজাম্বার উপর ব্যাজার হয়েছিলেন। দেখলে না—তার দেহটা সাতটুকরো করে ছিঁড়ে খেয়ে ফেললেন তাঁরা? লোকটার আর ইদানীং ধর্মেকর্মে মতি ছিল না, তারই জন্যে ওয়াজিরি-যুদ্ধে আমাদের হার হল। ওর জন্যে কেউ আর দুঃখ করো না, এবার নতুন রাজা হবেন—"

"কে হবে নতুন রাজা? মুজাম্বার ত ছেলে নেই!"—বলে অনেকে।

"দেবতাদের আদেশ পেয়েছি আমি—নতুন রাজা হবেন জায়টুঙ্গি সর্দার, ওয়াজিরি-যুদ্ধে যিনি সবচেয়ে বেশী বীরত্ব দেখিয়েছিলেন।"

"জায়টুঙ্গি রাজা হন, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঐ ওয়াজিরি রাজপুত্তুরটাকে আমরা ছাড়ব না। ও যখন মুজাম্বাকে মেরে ফেলেছে—"

"কোথায় পাবে আর তাকে? দেবতারা তাকে এনেছিলেন মুজাম্বাকে বধ করবার জন্যে। কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ওয়াজিরি দেশে ফেরত পাঠিয়েছেন। টোটেম ঠাকুরেরাই তাকে ঝিনুকমালা দিয়েছিলেন, তা না হলে সে পেল কোথায়?"

জায়টুঙ্গির অভিষেকের বাজনা বেজে উঠল।

ওদিকে তখন টারজান গায়ের কালো রং তুলে ফেলে হেনরির সঙ্গে মজা করে হরিণের মাংস খেতে শুরু করেছে।

হেডমাস্টারের কড়া শাসনে

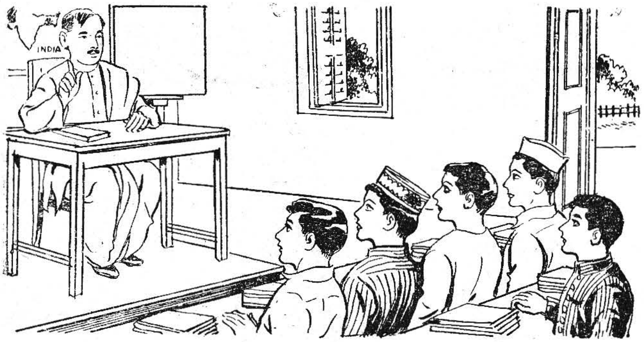

ডাঃ ইন্দু পাল, এম. বি., বি. এস্.

হ্যারিসন রোড ও মীর্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে "Mitra Institution" লেখা যে সাইনবোর্ডখানা আজকাল দেখতে পাও, ১৯২৫ সনে সেই সাইন-বোর্ডখানাই হ্যারিসন রোড ও সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের মোড়ের বাড়ি-খানায় টাঙানো ছিল। অর্থাৎ "মিত্র ইনস্টিটিউসন" স্কুলটি সেই মোড়ের বাড়িতেই বসতো।

সবে ভোলা গভর্নমেণ্ট হাইস্কুলের ক্লাস নাইন থেকে টেন-এ প্রমোশন পেয়েছি, ঠিক সেই সময় বাবা এলেন কলকাতায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এসিস্‌টেণ্ট সার্জনের পদে বদলি হয়ে। কলকাতায় কোন্ স্কুলে ভরতি হবো এই নিয়ে কথাবার্তা হয় বাবার সঙ্গে ও আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে। তিনি বাবাকে বোঝালেন হিন্দু বা হেয়ারে ওকে দেবেন না—দিতে হয় "মিত্র ইনস্টিটিউসনে" দিন। এ স্কুলে এমন বাঘা হেডমাস্টার আছেন যে তিনি "গাধা পিটিয়ে ঘোড়া" বানিয়ে দিতে জানেন।

ব্যস্, আর যায় কোথায়! তার পরদিনই "Mitra Institution" (main)এ ভরতি করে দিলেন!

ক্লাসে ঢুকে প্রথমটা ভড়কে গেলাম। কলকাতার সব ছেলে, সবাই চোখে-মুখে কথা বলে। একে মফস্বল স্কুল থেকে এসেছি তায় আবার মুখচোরা, কাজেই চুপচাপ একটি দরজার পাশে সুবিধামত একটি বেঞ্চে বসে থাকলাম। পাশের ছেলের সঙ্গে একটুআধটু কথার জবাব ছাড়া বড় বেশী কথা বলতাম না। ক্লাস টেন বা ফার্স্ট ক্লাস বসতো একেবারে উপরের তলায়—একপাশে খানিকটা খোলা ছাদ।

দুই তিনটে পিরিয়ড স্বাভাবিক ভাবেই কেটে গেল, তারপর হেডমাস্টারের ক্লাস। ইংরেজী পড়াবেন। পিরিয়ড আরম্ভ হবার আগে থেকেই হঠাৎ ক্লাসঘরটি একেবারে যাকে বলে "pin-drop silence"।

হেডমাস্টারমশায় এসে ঘরে ঢকলেন। পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, সাধারণ একটি থানের ধুতি হাঁটুর একটু নীচে পর্যন্ত ঢাকা ও পরনে একটা ফতুয়া। কেশবিন্যাস

কিছুই নেই। দোহারা চেহারা, মুখশ্রী সৌম্যভাবাপন্ন অথচ কঠোরতার ছাপ পরিস্ফুট। ইনিই হেডমাস্টার শ্রীসতীশকুমার ব্যানার্জী।

তিনি চেয়ারে বসবার পর হঠাৎ প্রায় দশ-পনেরটি ছেলে দাঁড়িয়ে পড়লো ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের কান নিজেরাই মলতে লাগলো। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য! ব্যাপারখানা বুঝতে না বুঝতেই আমার পাশের ছেলে সুশীল নাগ আমায় ঠেলে বললে, "'পকেট ডিকসনারী'" এনেছিস, 'টুয়েল্‌ভ্‌ পয়েণ্ট' এনেছিস, নয়ত দাঁড়িয়ে কান মল।"

এ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না।

হেডমাস্টারমশায় জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলেন এক এক করে—"কিরে, তোর কি?" তারপর আরেকটিকে এই ভাবে। কেউ জবাব দিল, "পকেট ডিকসনারী আনতে ভুলে গেছি স্যার", কেউ বা জবাব দিল—"টুয়েল্‌ভ্‌ পয়েণ্ট আনিনি স্যার।" দোষ স্বীকার করাতে হেডমাস্টারমশায় বললেন, "আচ্ছা বোস, বোস। আর যেন ভুল না হয়।"

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"তুই বুঝি নূতন এসেছিস? এ সব ত জানিস না, সব জেনে নিবি। একটা পকেট ডিকসনারী কিনবি—রোজ নিয়ে আসবি। আর নীচে আফিস ঘর থেকে এক আনা দিয়ে একটা চার্ট কিনবি—ওটাকে টুয়েল্‌ভ্‌ পয়েণ্টের চার্ট বলে। গ্রামারের common errorsএর বারোটি ঘর। ধর, আজকে যদি তোর syntaxএর একটা ভুল হয় তখুনি syntaxএর ঘরে একটা দাগ কাটবি। এই রকম আর কি। তারপর আমাকে দেখিয়ে সই করিয়ে নিবি।"

যথারীতি হেডমাস্টারমশায় পড়িয়ে, মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন করে ও ছেলেদের মুখ খুলিয়ে তবে ছাড়লেন। ক্লাস হয়ে গেলে ছেলেদের কাছ থেকে জেনে নিলাম হেডমাস্টারমশায় কি কি পছন্দ করেন ইত্যাদি। 'নিজের হাতে কানমলা খাওয়া'—এ এক অভাবনীয় ব্যাপার। অনেক স্কুলে ত পড়েছি কিন্তু কোথায়ও এ ব্যাপার দেখিনি। দোষ স্বীকার আগে হতে না করলে, যদি হঠাৎ ধরা পড় ত তবে আর রক্ষা নেই। কাজেই টুয়েল্‌ভ্‌-পয়েণ্ট বা ডিকসনারী না আনলে আগে থেকেই দোষ স্বীকার মারের হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায়।

হেডমাস্টারমশায়ের পড়ানোর ধরন অন্য রকম। নোট দেওয়া বা বাড়ির কাজ দেওয়া কিছু করতেন না। কোন ট্রানস্লেশন বা রচনা দেখে শুদ্ধ করবার জন্য খাতা বাড়ি নিয়ে যেতেন না। ক্লাসে এক একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করতেন ও সে যে উত্তর দেয় সেটাকে সংশোধন করে দিতেন। অন্যান্য ছেলেরা ঐ শুনে যার যার খাতা ঠিক করে নিত।

এক দিনের ঘটনা তোমাদের বলিঃ ক্লাসে পড়াতে পড়াতে হয়ত কোন ছেলেকে Reading পড়তে বললেন। স্পষ্ট ভাবে না পড়ে, মিনমিন করে পড়লে

তিনি অত্যন্ত চটে যেতেন। রমেন সেন নামে একটি ছেলে ছিল। ওর গলার আওয়াজ মেয়েলী ধরনের। ওকে একদিন হেডমাস্টারমশায় English reading পড়তে বললেন। রমেন পড়ছে কিন্তু হেডমাস্টারমশায় সরু আওয়াজ ও মিনমিন করে পড়াতে বিরক্ত হয়ে চটে যেতে লাগলেন। যতই চটে গিয়ে রমেনকে ভাল করে পড়তে বলছেন রমেনের গলা ভয়েতে ততই সরু হতে লাগলো। এদিকে হেডমাস্টারমশায়ের আর একটি স্বভাব ছিল ডেস্কের উপর পা তুলে বসা। রেগে তিনি গোড়ালি দিয়ে ডেস্ক ঠুকতে লাগলেন আর বার বার কিড়মিড় করে বলতে লাগলেন, "রমেন, আমি উঠব ?" রমেন ত ভয়ে পড়া ছেড়ে কান মলতে শুরু করে দিল—অর্থাৎ রমেন দোষ স্বীকার করতে লাগলো যে সে কিছুতেই সন্তুষ্ট করতে পারছে না।

কান মলা খেলে অল্প দোষ ক্ষমা হয় ও রাগ পড়ে যায়। কিন্তু যখন বেশী রেগে যান তখন কান মলাতে সন্তুষ্ট হন না। রাগও কমে না। রমেনের কানমলা খাওয়া সত্ত্বেও হেডমাস্টারমশায় বলতে লাগলেন, "ও কিচ্ছু হচ্ছে না, ও কিচ্ছু হচ্ছে না।"

এর পরে কি করতে হবে তাও ওর জানা ছিল—বুঝতে হবে, তখন নিজের হাতে নিজের গালে চড় মারতে হবে। চড় মারা চলতে থাকবে তাতে যদি হেডমাস্টার-মশায়ের রাগ পড়ে। যাহোক এমনি ধারা কিছুক্ষণ চলার পর তিনি বললেন, "হয়েছে, হয়েছে আর ছাদ পেটাতে হবে না।" তখন বোঝা গেল—মাপ হল।

আর এক দিনের ঘটনা—মেজাজ খুব ভালো সেদিন। বল্লেন—"আয় আজ তোদের Tennysonএর 'Dora' কবিতাটি পড়াই।" পড়াতে গিয়ে তিনি এমন একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করলেন যে অনেক ছেলে সেই শব্দটির মানেই জানে না। সঙ্গে সঙ্গেই দেখলাম পঞ্চাশটি ছেলের মধ্যে আটচল্লিশটি ছেলেই দাঁড়িয়ে কান মলতে আরম্ভ করে দিলে। দেখে শুনে আমিও অনেকটা চালাক হয়ে গেছি। আমিও দাঁড়িয়ে ওদের দলে ভিড়ে পড়লাম।

একমাত্র জয়দেব মুখার্জী বসে ছিল। অর্থাৎ সে এই শব্দটির মানে জানে। তখন তিনি বললেন, "কিরে জয়দেব, বল্—কি মানে।"

জয়দেব যথাযথ উত্তর দিল। হেডমাস্টারমশায় খুশী হলেন। বসে থেকে যদি ঠিক মানে বলতে না পারত তবে যে বিরাশী-সিক্কার ওজনের চড় পড়ত, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

এহেন হেডমাস্টারমশায় একদিন অনুপস্থিত থাকলে সবাই যে উল্লসিত হত তাতে আর সন্দেহ কি ? দমদম থেকে তিনি আসতেন। একবার তিনি পড়ে যান, পায়ে চোট লাগায় প্রায় সাত দিন স্কুলে আসতে পারেননি। যে দিন ক্লাসে এলেন, তিনি আমাদের বললেন, "তোরা ভেবেছিলি বুড়ো পা ভেঙে পড়ে আছে—বেশ ভালই হয়েছে, তাই না রে ?"

এর উত্তরে একেবারে পঞ্চাশটি ছেলেই দাঁড়িয়ে কান মলে বললে, "সার! এরকম কুচিন্তা যেন আমাদের মনে কখনো স্থান না পায়। এরকম ভাবা মহাপাপ।"

বুড়ো একেবারে গলে জল। খুশী হয়ে বললেন, "বোস, বোস, তোদের মারধোর করি বটে, কিন্তু আসলে তোরাই আমার প্রাণ।"

বাস্তবিক, তিনি ছিলেন একদিকে বজ্রের মত কঠোর আবার অন্য দিকে কুসুমের মত কোমল।

আমার বাবা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। হাসপাতালের cottageগুলিকেই ডাক্তারদের থাকবার জন্য বাসা বাড়ি করে দেওয়া হয়েছিল। আমি কোথায় থাকি একদিন জিজ্ঞেস করায় আমি বলেছিলাম, "মেডিক্যাল কলেজের কটেজে।" শুনে তিনি দুঃখিত হয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, তোর বাবা সেই থেকে এখনও কটেজে, এখনও অসুখ ভাল হল না?"

এই একটু স্নেহমাখান কথায় বুঝতে পারলে তিনি কত দরদী ছিলেন।

Pre-test হবার পরেই ছুটির দিনে ইংরেজীর কোচিং ক্লাস নেবার ব্যবস্থা হলো—নিজেই নিতেন। এমন এক দিনে কলকাতায় হয় ভীষণ বৃষ্টি। কলেজ স্ট্রীট, হ্যারিসন রোড ও অলিগলি সব জলে জলময়। হাঁটুজল কিংবা তারও বেশী দাঁড়িয়ে যায়। এদিকে হেডমাস্টারের কোচিং ক্লাস, না গেলে রক্ষা থাকবে না তাও জানি, কিন্তু উপায় ছিল না, গেলাম না। তার পরদিন যথারীতি স্কুলে যাই। হেডমাস্টারের পিরিয়ডে আমাদের বুক দুরদুর। না জানি কি প্রলয়কাণ্ড হয়! হেডমাস্টারমশায়ের আসামাত্র প্রায় সব ছেলেই দাঁড়িয়ে কান মলতে আরম্ভ করলো, ঐ সঙ্গে আমিও। অর্থাৎ আগে থেকেই দোষ স্বীকার করলাম। তিনি বললেন, "জলের জন্যে আসতে পারলি না বলছিস সব, কিন্তু সেদিন যদি ম্যাট্রিক পরীক্ষা থাকতো তবে যেতিস কি যেতিস না?"

বাধ্য হয়ে আমাদের বলতে হল, "হ্যাঁ সার যেতাম।"

"তবে এলি না যে বড় আমার ক্লাসে!"

যাহোক সে যাত্রা বিশেষ কিছু হয়নি।

এমনি কড়া শাসনে আমাদের দিনগুলি কাটতো। পড়াশুনায় মনোযোগ আনাবার জন্যে আমাদের উৎসাহও খুব দিতেন। পড়াশুনা নিজেই শুধু দেখাতেন তা নয়, অন্যান্য মাস্টারমশায়দের প্রতিও খুব কড়া নজর রাখতেন। পড়াতে পড়াতে বলতেন, "তোদের লক্ষ্য থাকবে সব সময় স্কলারশিপের দিকে। তীর ছুড়বি স্কলারশিপের দিকে। যদি নাও লাগে অন্ততঃ ফার্স্ট ডিভিসন হবে। থার্ড ডিভিসন লক্ষ্য করলে ফেল ডিভিসন হবে।"

তারপর এই প্রসঙ্গে বললেন, "এবার (অর্থাৎ 1925) ম্যাট্রিকএ ফার্স্ট হয় তারকনাথ সেন। ওর নম্বর জানিস্—৭০০র মধ্যে ৬৪৬; ছ'টি লেটার, বাংলাতেই

হচ্ছে সব চাইতে কম, তাতেও ৮০ পেয়েছে। তোদের মধ্যে কেউ কেউ চেষ্টা করলে তারকনাথের সমকক্ষ হতে পারিস।”

এই উৎসাহের ফল অবিশ্যি ভালই হয়েছিল। সেবার ১৯২৬এর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তিনজন—তারাকৃষ্ণ বসু, জয়দেব মুখার্জী ও প্রমোদচন্দ্র বড়াল স্কলারশিপ পেয়ে স্কুলের সম্মান বজায় রেখেছিল। অঙ্কে মোট নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হবার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তারাকৃষ্ণ ও জয়দেব দুজনেই। আর হেডমাস্টারমশায়ের মান আরো রাখলে আমাদের জয়দেব ইংরেজীতে লেটার পেয়ে।

১লা মার্চ ১৯২৬ সন ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিন। সিট্ পড়লো সিনেট হলে। হেডমাস্টারমশায় Intervalএ এসে হাজির। সবাইকে সস্নেহে নানাভাবে উপদেশ দিলেন আর দিলেন সাহস ও বল ভরসা। মুহূর্তের মধ্যে আমরা সব ভুলে গেলাম—হেডমাস্টারমশায়ের সেই উগ্রমূর্তি ও তাঁর কড়া শাসন। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল ও ওঁর পদধূলি নিয়ে ধন্য মনে করলাম।

আজকালকার দিনে এরকম কড়া শাসনের রেওয়াজ নেই, নিয়মবিরুদ্ধও বটে। তবে কড়া শাসনের ফল সেদিনকার ছেলেদের ওপর ভালই ফলতো। কি পরীক্ষার ফলাফলের দিক্ দিয়ে, কি নিয়মানুবর্তিতার দিক্ দিয়ে, সবদিকেই সাফল্যলাভ করতো।

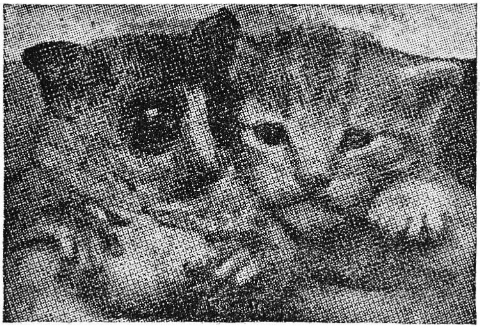

সুন্দর ও ভয়ংকর

দুটিই বেড়ালছানা। কিন্তু একটি কেমন কমনীয় সুন্দর, আর একটি রুদ্র ভয়ংকর! প্রকৃতির খেয়ালে একটির চোখ যেন আগুনের ভাঁটা!

জ্যাকব দিক্ ভুল করে ভুল পথে চলে যাচ্ছে।

ভোরের আলো

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চয়ই ভাগ্য বিরূপ; তা নইলে এমন কখনো হয়? মাত্র পনেরো-বিশ মাইল পথ চলতে কি পথ হারিয়ে ফেলে কেউ? কিন্তু জ্যাকব আজ তাইই করে ফেলেছে!

কচি ছেলে সে নয়। গরীব সে সন্দেহ নেই, কিন্তু মুখ্যুও সে নয়। সারাজীবন এখানে-ওখানে কত হাঁটাহাঁটিই না করেছে! এমন অবস্থা হয়নি তো কোনদিন!

একটা ধাড়ী লোক। এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় সে ডাক নিয়ে গেছে সারা-জীবন। আর এই কাজ সে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে করে আসছে। ডাক বয়ে বেড়ানোই ছিল তার কাজ! বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়েই ছিল তার যাতায়াতের পথ। কোনদিন সে পথহারা হয়নি। কিন্তু আজ সে তার পথ হারিয়ে ফেললো!

শুধু পথই নয়, দিক্‌ও সে হারিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়! সোজা পুবদিকে তার যাবার কথা; কিন্তু সে বোধহয় অন্ধকারে দিক্ হারিয়ে দেশের উত্তর সীমানায় এসে গেছে! তাই পথে এত বরফ দেখা যাচ্ছে।

সারারাত তার চলার বিরাম নেই, কিন্তু ক্রমশঃই সে এসে গেছে গভীর অরণ্যে! পথ তার ক্রমশঃই যেন সরু হয়ে এসেছে!

এই ঘটনায় জ্যাকব ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ে! নিজেই নিজেকে ধিক্কার দেয়! রাগে-দুঃখে দু'হাতে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়!

হায়, হায়, এ তার কি হলো? কি করবে সে? চীৎকার করে তার বলতে ইচ্ছে হয়, "বাঁচাও! কে কোথায় আছ, বাঁচাও!" কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়, কি হবে চেঁচিয়ে? এ বনে কি মানুষ আছে যে, কেউ সাড়া দেবে, বা কেউ এগিয়ে আসবে তাকে সাহায্য করতে?

জ্যাকবের মনে হয়, সে তার প্রথম জীবনে এক বৈজ্ঞানিক পর্যটকের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। তাঁর সঙ্গে সে অনেকদিন কাটিয়েছে! সে ভদ্রলোক ছিলেন খুবই জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্। জ্যাকবকে

তিনি অনেকদিন বলেছিলেন, "জ্যাকব, বিপদে মুষড়ে পড়ো না কোনদিন। শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হলে যেমন মনে বল চাই, সাহস চাই, নইলে শত্রু তোমাকে পেয়ে বসবে, ভাগ্যের সঙ্গেও ঠিক তেমনি ভাবেই চলতে হয়; নইলে ভাগ্যের খেলায় তুমি হেরে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য।"

আরো একটা দামী কথা তিনি অনেকবার বলেছিলেন। জ্যাকবের আজ সে কথাও বিশেষ করে মনে হয়।—

সে ভদ্রলোক বলেছিলেন, "মনে কর দুস্তর অরণ্যে তুমি পড়ে গেছ, পথ তোমার ফুরোয় না। অথবা বরফের মহাসমুদ্র তোমার সম্মুখে, বরফের শেষ নেই। তেমন অবস্থায় কি করবে তুমি? রাতভর পথ চলবে? না, নিজের অদৃষ্টকে গাল-মন্দ করে, বসে-বসে ঝিমুতে শুরু করবে?

এর একটাও তোমার উচিত হবে না। কারণ, সারারাত যদি হাঁটতেই থাকো, তা হলে কোথায় যে কতদূর গিয়ে পৌঁছুবে, কে জানে?

এক জায়গায় বসে বসে যদি ঝিমুতে থাকো বা নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে থাকো, তা হলেও তোমার ক্ষতিই হবে জ্যাকব! তা হলে মনের বল তোমার কমে আসবে; আর ঠাণ্ডা তুষার বা বরফ তোমার দেহটাকেও জমাট বরফের মত ঠাণ্ডা করে দেবে! সেও হবে খুব বিপজ্জনক। হয়তো বরফের মাঝেই হবে তোমার চির-সমাধি!

তখন কি করবে জানো?—

নিজেকে সুস্থ-সবল রাখবার জন্যে তখন তোমাকে চলতে হবে সারারাত, কিন্তু সে চলায় তোমার আর বেশী পথভুল বা দিক্‌ভুল হবার আশঙ্কা থাকবে না। তুমি সামনের দিকে হেঁটে গেলে একশো পা, আবার একশো পা তুমি পিছিয়ে এলে—নিজের পায়ের ছাপ দেখে পেছন দিকে হেঁটে হেঁটে!

এর ফলে, শরীরের তাপ তোমার অক্ষুণ্ণ রইবে আর ক্লান্তি ও অবসাদে দেহ-মন ভেঙে পড়বে না। রাতটা এমনি করে কেটে গেলে, দিনের আলোয় একটা-কিছু উপায় তোমার চোখে ফুটে উঠবেই।"

অসহায় জ্যাকবের মনে আজ সেই অতীতের কথা মনে হয়, বৈজ্ঞানিকের উপদেশই সে অনুসরণ করতে লাগলো। যতটা সে হেঁটে যায়, আবার সে পিছিয়ে আসে ততটা! এইভাবেই সে নিজেকে কর্মব্যস্ত রাখতে শুরু করলো।

কিন্তু তবু কি জানি, কখন সে কেমন করে, বুঝি আনমনা হয়েছিল! আর সেই সুযোগে তার পা তাকে কোথায় টেনে নিয়ে গেল! হঠাৎ খেয়াল হতেই সে তাকিয়ে দেখে, সে তো আর আগেকার বনপথে নেই! অজানতে কোথায় সে চলে এসেছে! এখন উপায়?—

জ্যাকব বুঝতে পারে, যতদূরেই সে আসুক না কেন, বরফের সমুদ্র সে পেরিয়ে আসতে পারেনি। এখনো তার পায়ের তলায় অফুরন্ত বরফ—সাদা ধব্‌ধবে বরফ !

সে আরো বুঝতে পারে, শুধু সুমুখে-পিছনে পায়চারি করে, সে বেশীকিছু সুবিধা করতে পারবে না। কারণ, সে হয়তো তার অজানতেই আবার কোথায় সরে চলে যাবে! তার চেয়ে যে কোন একটা বড় গাছকে কেন্দ্র করে, তার চারদিকে ঘোরাটা মন্দ কি ?

সে তখন তাইই শুরু করলো। মোটা একটা গাছের চারদিকে শুরু হলো তার পরিক্রমা।

মাঝে মাঝে চোখ তার ঘুমে জড়িয়ে আসে। ঘুমের ঘোরে পাছে কোথাও সে সরে যায়, এই হলো তার একমাত্র ভয়। কিন্তু কিছুক্ষণের চেষ্টায় একটা অভ্যাস হয়ে গেলে, মানুষ তখন অভ্যাসের বশেই কাজ করে যায়—ঠিক কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত !

গাছকে কেন্দ্র করে জ্যাকব ঘুরছে।

জ্যাকবও যেন তার অভ্যাসবশতঃই নিজের অজানতে শুধু গাছটিকেই প্রদক্ষিণ করতে থাকে !

কিছুক্ষণ এমনিভাবে ঘুরেই তার মনে হলো, এ তো মন্দ নয়! এর আগে সে যা করছিল, এ কাজ ঠিক তারি মত। দেহের তাপটা যেন না কমে, আর দেহ যেন নেতিয়ে না পড়ে কুড়েমির ফলে, এই তো সে চায়! গাছটিকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করার ফলে, তার দেহ-মনে সম্ভবতঃ কোন পরিবর্তনই আসবে না! কাজেই এই নতুন কাজে জ্যাকবের বেশ আনন্দই হলো!

বুঝি প্রায় সারাটা রাতই এমনিভাবে কেটেছিল ! খুব বেহুঁশভাবেই তার পা চললো প্রায় সমস্ত রাত। দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, আকাশের একটা দিক্ যেন ঈষৎ সোনালী আলোয় ঝিলমিল করে উঠছে ! সে বুঝতে পারে রাতভোর সে পা চালিয়েছে ; বুঝি এইমাত্র ভোর হতে শুরু করেছে ! ভোর হওয়ার অনুভূতির সঙ্গে তার পেটের মধ্যে একটা নতুন অনুভূতি যেন তালগোল পাকিয়ে উঠলো ! সে স্পষ্ট অনুভব করে, তার ক্ষিদে পেয়েছে ভয়ানক। মনে হলো, পেটের নাড়ীভুঁড়ি পর্যন্ত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে।

কিন্তু কি সে খাবে ? চারদিকে অফুরন্ত বরফ ছাড়া তো আর কিছুই নেই !

বরফ কি খাওয়া যায় ? খেলেই বা কত খাবে ? আর বরফ খেয়ে কি পেট ভরে ? ভরুক বা না-ভরুক, ক্ষিদে মিটুক বা না-মিটুক, জ্যাকব স্থির করলো, বরফই সে খাবে। নইলে আর যে থাকা যায় না ! কিন্তু কেমন করে খাবে ? পায়ের তলায় ও তার আশেপাশে যে বরফ সে

বরফ-গলা জলে নোনতা বিস্কুট গুলে জ্যাকব গরম করছে।

দেখছে, হাতের আঁজলা পুরে তাই সে খাবে কি? খেতে হয়তো সে পারে, কিন্তু সে বরফ খেলে তার কোন অসুখ-বিসুখ হবে না তো? এত ঠাণ্ডা জিনিস—সে জিনিস খেলে নিশ্চয়ই একটা কিছু অসুখ হয়ে পড়বে।

জ্যাকব জানে, কোন জিনিসই একটু গরম করে খেলে, কোন আশঙ্কা থাকে না। সে স্থির করলো একটু গরম করেই সে খাবে, আর তাতে একটুখানি নুন মিশিয়ে খাবে।

কিন্তু নুন কেন?—

জ্যাকবের সাধারণ বুদ্ধিই তাকে বলে দিল, তরল জিনিস মাত্রই এই দারুণ শীতে জমে যেতে চায়। রক্তে জলীয় অংশ বাড়াতে হলে একটু নুন মিশিয়ে খাওয়াই উচিত।

সংকল্প অনুযায়ী সে কাজে অগ্রসর হলো।

সে তার কোটের ভেতর-পকেট থেকে সিগারেট-লাইটার বার করলো। গাছের একটা কোটর থেকে কিছু শুকনো পাতা বার করে, তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। তারপর একটা পাত্রে করে কিছু বরফ নিয়ে আগুনের ওপর সেটি ঝুলিয়ে রাখলো। বরফ গলে জল হলো বটে কিন্তু এত শীতে বুঝি আর সে জল গরম হতে চায় না! যাহোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই সামান্য গরম হয়ে উঠলো সেই বরফ-গলা জল। সে তখন কয়েক খণ্ড নোনতা বিস্কুট পকেট থেকে বার করে তার মধ্যে ফেলে দিল।

বিস্কুটও গলে গেল বরফ-গলা জলে, আর সবটা সামান্য একটু গরমও হয়ে উঠলো—বড়জোর মানুষের দেহের মত।

জ্যাকব পাত্রটি একটু নাড়াচাড়া করে, দিব্যি চায়ের মত চুক্ চুক্ করে খেয়ে ফেললো। মনে হলো, দেহ তার কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে, ক্লান্তি ও অবসাদ যেন কেটে গেল তার দেহ-মন থেকে!

উষার আলো তখন গাছে গাছে ছড়িয়ে পড়েছে। তরল সোনা যেন কে তখন সারা বনপথে মুঠো-মুঠো বিলিয়ে দিতে শুরু করেছে। আশা ও আনন্দে জ্যাকবের সারা মন ভরপুর হয়ে যায়। সে দেখতে পায় জমাট বরফ ও তুষারে যেন ভাঙন ধরেছে! শিথিল হয়ে আসছে ধবধবে সাদা তুষার! রোদের ছোঁয়াচ লাগতে না-লাগতেই গলন শুরু হয়েছে!

দ্বিগুণ আশায় মন তার সতেজ হয়ে ওঠে। নিশ্চয়ই কোন মানুষ বা কোন পথচারীর দল তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আবার লোকালয়ের শান্ত পরিবেশে!

সে এধার-ওধার তাকায়! মনে তার গোপন আশা—নিশ্চয়ই কেউ তাকে দেখে ফেলবে, শুনবে তার রাতজাগা দুঃখের কাহিনী, আর তাকে তুলে নিয়ে যাবে!

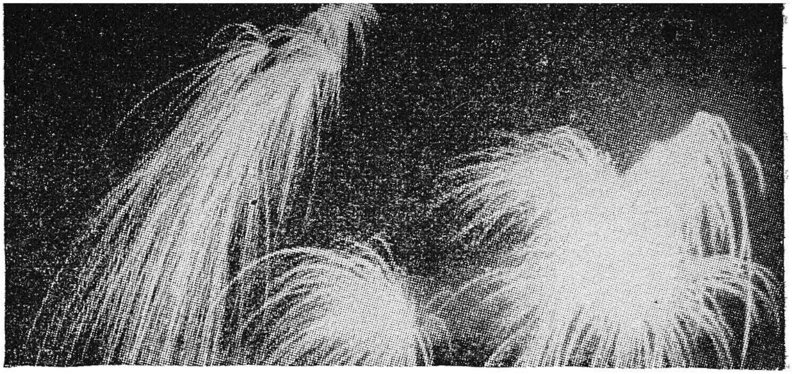

এই আলোর ঝলকানিতেই জ্যাকব অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

কিন্তু কই? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল, কেউ এলো না তো সে পথে!

ক্রমে দুপুর গেল, বিকেল হলো। রাতও বুঝি আবার এসে যায়! হিমেল হাওয়া আবার তার সারা দেহে কাঁপন ধরিয়ে দেয়। ধীরে ধীরে কোমল তুষারের আবরণ লতাপাতা, গাছপালার মাথা আচ্ছন্ন করে দেয়!

জ্যাকব শিউরে ওঠে নানা আতঙ্কে। গোটা একটা দিন কেটে গেছে। আহারের মধ্যে একবার মাত্র একটুখানি বরফ-গলা জল! কিন্তু তাকে আহার বলা যায় না। তাই অনাহারে, অনিদ্রায় ও ক্লান্তি-অবসাদে জ্যাকব এবার একেবারেই ভেঙে পড়লো! কিন্তু সে আর বেশীক্ষণ ভাবতে পারে না। শান্তিদায়িনী নিদ্রা কখন যে তাকে কোলে টেনে নিলে জ্যাকব তা বুঝতেও পারলো না!

কতক্ষণ তার এমনিভাবে কেটেছিল, সে তা জানে না। সহসা তার ঘুম ভেঙে গেল প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণে!

ধড়মড় করে সে উঠে পড়ে। উঠেই দেখে, বাঃ! আলোর ফুলঝুরিতে চারদিক্ ঝলমলে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে! সে আলোয় বহুদূর অবধি আলোকিত হয়ে উঠেছে বলে তার মনে হলো! আর কানে এলো অতি ঊর্ধ্বে উড়ে যাওয়া কোন বৃহদাকার বিমানের গুমগুম শব্দ!

কি এ?

জ্যাকবের মনে হলো, "তবে কি আমি কোন সামরিক আওতার মধ্যে এসে পড়েছি? হয়তো আশেপাশে কোনো স্থানে মাঝে মাঝে সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের মহড়া হয়ে থাকে। এই বিস্ফোরণ আর আলোর ঝিলিমিলি বোধহয় তারই একটা কিছু অঙ্গ!"—

হঠাৎ আবার একটা বিস্ফোরণ! সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র আলোর ঝলক—বৃহৎ কোন টর্চের আলোর মত!

জ্যাকবের চোখ বুঝি অন্ধ হয়ে গেল, আর তক্ষুনি সে তার জ্ঞান হারিয়ে সেইখানেই লুটিয়ে পড়লো!—

জ্ঞান যখন হলো, তখন সে চেয়ে দেখে, সত্যই সে এক সামরিক তাঁবুর মধ্যে বাস করছে !

আমেরিকার উত্তর অংশে, নানা দুর্ভেদ্য বন-জঙ্গলের মধ্যে যথার্থই সামরিক অস্ত্রশস্ত্রের কত মহড়া হয় ! প্রথম আলোর ঝলকানিতেই সামরিক বিভাগের বিজ্ঞানীরা জ্যাকবের অস্তিত্ব টের পেয়েছিল। তাই দ্বিতীয়বার আলোর ঝলকানিতে তারা জ্যাকবের ফটো তুলে নিয়েছিল।

তারপর জ্যাকবের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে তারা বয়ে নিয়ে আসে নিজেদের শিবিরে। সেখানে তার দুঃখ-কষ্টের বর্ণনা শুনে তারা তো অভিভূত হয়ে যায় !

এরপর জ্যাকবকে তারা তাদেরই একজন সহকর্মী করে নিয়েছিল ! অসহ্য লাঞ্ছনার পর জ্যাকব আবার ফিরে পেলো তার সম্মান, পেলো তার পুরস্কার !

উজল পাতা

ছোট্ট বাঁশি, একটুকু ফুঁ, তাতেই বাজে গান,
নাচ যে দেখায় ছবির মানুষ দিয়ে হাতের তান॥

দেখে মনে হয় এটা কোন পুতুলের ফটো। আসলে এটা পুতুল নয়। তবে কিসের ছবি? জামসেদপুর থেকে শ্রীনীলমণি ঘটক জানিয়েছেন এটা তাঁর আঁকা ছবির ফটো।

ঠকাবে না

পরীক্ষার কিছুদিন আগে একদিন শিক্ষক মহাশয় ছেলেদের কেমন পড়া তৈরী হয়েছে খোঁজ নিচ্ছেন। সেদিন তিনি প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বইটা নিয়ে পাতা খুলেই দেখেন হাতির ছবি। তাই প্রথম ছেলেকে ডেকে প্রশ্ন করেন, "তুমি কি কখনও হাতির চামড়া দেখেছো?" শিক্ষক মহাশয় ভেবেছিলেন ছেলেটি চুপ করেই থাকবে। কিন্তু তিনি তার উত্তর শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

ছেলেটি বলেছিল, "হ্যাঁ।"

তখন শিক্ষক মহাশয় আবার জিজ্ঞাসা করেন, "হাতির চামড়া কোথায় আছে?"

উত্তর এল, "হাতির গায়ে।"

বাস্তুভিটা

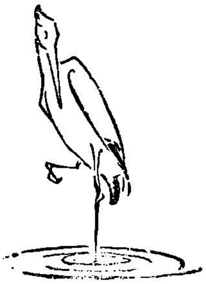

শ্রীগণেন্দ্র চক্রবর্তী

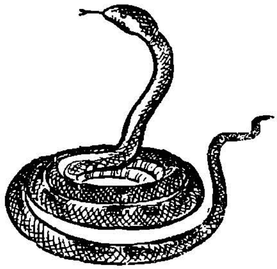

অনেক, অনেক দিন আগে ভদ্রাবতী নগরীর রাজপথের পার্শ্বে ছিলো এক বুড়ো বটগাছ। সেই গাছের উপর বাসা বেঁধে ছিলো এক বক; আর গাছের গোড়ার দিকে কোটরে থাকতো এক কালো সাপ।

কালো সাপ আর সাদা বকের মধ্যে ছিল ভারী বন্ধুত্ব। একে অন্যকে সব সময়েই বিপদ থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করতো।

একদিন হয়েছে কি! দুপুরবেলা সাদা বক গাছের ডালে বসে ঘুমাচ্ছে, এমনি সময়ে এলো এক শিকারী। বককে লক্ষ্য করে সে তীর ছুড়তে যাবে, কোটর থেকে তাই দেখে সাপ দিল ফোঁস করে এক লাফ। শিকারী 'কামড়ে দিয়েছে রে' বলে দিল দৌড়। বক সে চীৎকারে ঘুম থেকে উঠে বুঝলো বন্ধু সাপ তার জীবন বাঁচিয়েছে।

আর একদিন শীতের বিকালে কালো সাপ কোটর ছেড়ে বটগাছের নীচে এসে রোদে ঘুমাচ্ছিলো; কেউ কোথাও নেই। বেশ আরামে নাক ডাকছে সাপের, এমনি সময়ে এলো এক সৈনিক, হাতে তার ধারালো অসি। সাপ দেখেই তার হাত নিশপিশ করে উঠলো; অসি তুলে মারতে যাবে এক কোপ, সঙ্গে সঙ্গে হুস করে নেমে এলো গাছের উপর থেকে সাদা বক। নেমেই তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে সৈনিকের চোখে মারলো ঠোকর। বাপ্ বাপ্ বলে সৈনিকটি চোখে হাত দিয়ে বসে পড়লো মাটিতে।

চীৎকারে কালো সাপের ঘুম ভেঙে গেল। নিজের কী বিপদ বন্ধুর দয়ায় কেটে গেছে বুঝলো।

শুধু প্রাণরক্ষার ব্যাপারে যে একে অন্যকে সাহায্য করতো তা নয়, খাবার সংগ্রহ ব্যাপারে উভয়ে উভয়কে সাহায্য করতো।

রাজধানীর জনবহুল রাজপথের ধারে সাপের চলাফেরা সবসময়ে সুবিধাজনক নয়; বেচারী দিনের বেলায় প্রায়ই বের হতে পারতো না খাবার সংগ্রহে। বক

যদিও বা উড়ে যেতো কিন্তু তবু খুব সাবধানে যেতো ; কারণ চারিদিকে লোকজন। কোন্ দিক থেকে যে বিপদ আসে বলা কঠিন।

তাই দুজনে মিলে পরামর্শ করলো যাতে সহজেই উভয়েই খাবার পেতে পারে।

প্রথম দিনে কালো সাপ ভার নিলো সাদা বকের খাবার সংগ্রহের।

মেছুনী চলেছে নগরীতে চুবড়িভর্তি মাছ নিয়ে ; যেই না সে বটগাছের নীচে সাপের কোটরের কাছে এসেছে অমনি সাপ দিল ফোঁস করে লাফ। ভয় পেয়ে মেছুনী মাছের চুবড়ি ফেলে পালিয়ে যেতে বকের তখন কি স্ফূর্তি!

বক কিন্তু করলো বেজায় মজার কাণ্ড। সাপের খাবার যোগাড় করে দিতে হবে তার। গয়লা চলেছে মাথায় নিয়ে দুধের ভাঁড় ; বটগাছের নীচে আসতেই উপরে কিসের শব্দ শুনে বেচারী চোখ তুলে চাইতেই উপর থেকে বক তার চোখে মুখে ত্যাগ করলো বিষ্ঠা। বেচারী গয়লা রাম রাম বলে চোখ মুছতে গিয়ে তাল সামলাতে পারলো না। মাথা থেকে দুধের ভাঁড় পড়ে গিয়ে দু'টুকরা হয়ে গেল। তারপর সাপের খাবারের জন্যে তার আর চিন্তা রইলো না।

এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটতে লাগলো। গয়লারা আর বটগাছের পথ মাড়ায় না, মেছুনীরা যায় নগরের অন্য রাস্তা দিয়ে অনেক দূর ঘুরে।

বটগাছের নীচের ব্যাপার ক্রমে ক্রমে লোকের মুখে ছড়িয়ে পড়লো। নগর কোটাল রাজসভায় একদিন কথাটা রাজাকে জানালো। চাইলো এর প্রতিকার।

সেদিন দুপুরেই পড়ি-কি-মরি করে ছুটে এলো বক। সাপকে ডেকে বললো, "ভাই, ভারী বিপদ! কাল রাজার লোকজন আসছে বটগাছ কেটে ফেলতে, একেবারে মূলসুদ্ধু গাছ উপড়ে ফেলবে। আমি শুনে এসেছি সবাই বলাবলি করছে।"

সাপ শুনে বললো, "এ তো ভয়ানক বিপদ্! আমার যে ডিম থেকে এখন বাচ্চা বেরনোর সময়। নিজে না হয় বাঁচতে পারি পালিয়ে গিয়ে, কিন্তু ডিম ফেলে যাই কি করে?"

কাঁদো কাঁদো গলায় বক বলে, "আমার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। আমার তো দুদিন হলো ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েছে, ওর চোখ ফোটেনি, উড়তে শিখতে তো অনেক দেরি। বাচ্চা ফেলে নিজের মরাবাঁচা দুইই সমান। আমি কিছুতেই বাচ্চা ফেলে যাবো না। এখানেই মরবো।"

সাপও জানায় সেও তাই করবে, এখানেই মরবে।

দুজনে চুপ করে থাকে। খানিক পরে সাপ বলে, "দেখ ভাই, একটা উপায় আছে, আমাদের বাসা ছেড়ে যেতে হবে না যদি তুমি আমার কথামত কাজ করো।"

বক কক্ কক্ করে জানায় সাপ যা বলবে সে তাই করতে রাজী।

সাপ তখন জানায় সে যেন নদীর তীর থেকে গোল দেখে ছোট পাথরের একটা নুড়ি নিয়ে আসে।

বলামাত্র বক উড়ে গিয়ে নদীর তীর থেকে নিয়ে আসে সাপের কথামত পাথরের নুড়ি। সাপ নুড়িটিকে বটগাছের কোটরের কাছে রাখতে বলে।

তারপর সাপ বলে, যাও ভাই, এবার খানিকটা সিঁদুর নিয়ে এসো।

বক তার বাচ্চার মায়ায় উড়ে যায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এক বাড়ির পিছনের বারান্দায় মেয়েরা বসে গল্পগুজব করছে, চুল বাঁধছে, একে অন্যের কপালে দিচ্ছে সিঁদুরের টিপ।

বক চুপ করে বসে থাকে নিকটে একটি আতাগাছে। মেয়েরা যেই সিঁদুরের কৌটা মাটিতে রেখে গল্পে মেতেছে, অমনি বক কৌটা মুখে তুলে নিয়ে ঝট্ করে উড়ে গেলো।

সিঁদুরের কৌটা মুখে নিয়ে বক হাজির হলো সাপের কাছে। সাপ তখন বললো তাকে ঠোঁট দিয়ে খানিকটা সিঁদুর পাথরের নুড়ির গায়ে মাখিয়ে দিতে, আর খানিকটা সিঁদুর ছড়িয়ে দিতে কোটরের চারপাশে।

বক তাই করে দিলো।

তখন রাত হয়ে এসেছে। সাপ জানালো, ভাই, কাল খুব ভোরে খানিকটা ফুল এনে দিতে হবে।

বক পড়লো সমস্যায়। গাছ থেকে ফুল তুলে আনা তার পক্ষে কঠিন।

সাপ তখন বুদ্ধি দিল। রাজার শিবমন্দিরের পাশে পূজার পর ফেলে দেওয়া বাসী ফুল স্তূপাকার হয়ে আছে। বক যেন সেখান থেকে নিয়ে আসে ফুল।

পরদিন ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিয়ে আসে বেশ কয়েকটা ফুল শিবমন্দিরের পাশ থেকে।

এদিকে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হয় নগরকোটাল লোকজন নিয়ে বটগাছের নীচে, আদেশ দেয় সঙ্গের লোকদের গাছ কাটতে।

ওরা এগিয়ে গাছের গোড়ার দিকে এসেই পিছিয়ে যায়। অবাক হয়ে সবার সাথে নগরকোটাল দেখে অদ্ভুত ব্যাপার।

বটগাছের কোটরের চারিদিকে সিঁদুরের দাগ, কোটরের ভিতরে ফুলের উপরে দেখা যাচ্ছে এক সিঁদুরমাখা শিবলিঙ্গ, আর সেই শিবলিঙ্গ জড়িয়ে ফণা তুলে বসে আছে এক কালো সাপ ; সাপের ফণায় বসে আছে এক সাদা বক।

কোটালের সাথের লোকজন মাটিতে পড়ে প্রণাম করে শিবলিঙ্গকে।

ছুটে যায় নগরকোটাল রাজসভায়। খবর পেয়ে পাত্রমিত্রসহ রাজা আসেন বটগাছের নীচে। আসেন রাজপুরোহিত।

রাজপুরোহিত সব দেখে বলেন, মহারাজ, এখানে জাগ্রত বিগ্রহ আছেন। এ আপনার রাজ্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান। এখানে এই বটগাছ রেখে আপনার মন্দির তৈরি করা কর্তব্য।

রাজা তখনই সেখানে মন্দির তৈরির আদেশ দেন। আর আদেশ দেন—কেউ যেন কালো সাপ আর সাদা বকের কোন ক্ষতি না করে। সাপের খাবার দুধ যেন দৈনিক বটগাছের নীচে রাখা হয়। আর বক যেন পায় প্রত্যহ মাছের ভোজ।

সেদিন রাতে লোকজন সব চলে গেলে বক ধন্যবাদ জানায় সাপকে, ভাই, তোমার বুদ্ধিতে আমাদের বাস্তুভিটা রক্ষা পেলে। না হলে তো আজ কাচ্চাবাচ্চা ফেলে পথে পথে ঘুরতে হতো।

সাপ বলে, বন্ধু, তোমাকেও ধন্যবাদ। বাস্তুহারা না হওয়ার জন্য তুমিও কম করনি।

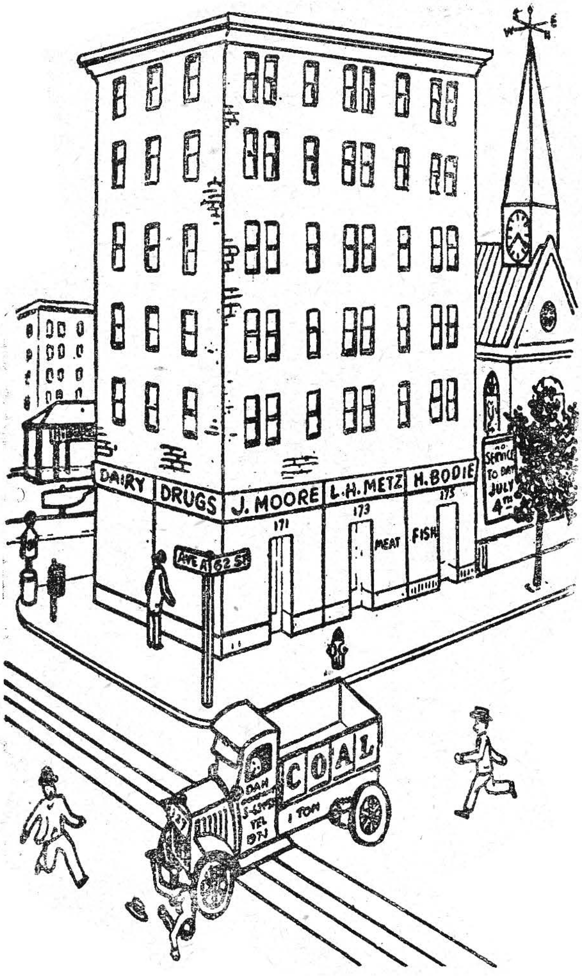

আকস্মিক দুর্ঘটনা

(স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা)

মনে করো তুমি বিলেত গেছো আরো বেশী লেখাপড়া শিখতে। একদিন রাস্তায় যেতে যেতে হঠাৎ কানে এল কে যেন গাড়ি চাপা পড়েছে। ঘাড় ঘুরিয়ে তুমি ঘটনাটা দেখে তিন মিনিটের মধ্যে সেখান থেকে নিজের কাজে চলে গেলে। এবার যদি তোমায় সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয় তাহলে কতটা বিষয় তুমি ভেবে বলতে পারবে বল তো ?

তোমার স্মৃতিশক্তি পরীক্ষা করার জন্যে সেই রকম একটা দুর্ঘটনার ছবি এখানে ছাপা হল। ছবিটা ভাল করে তিন মিনিটের জন্যে দেখে নাও। তারপর বই বন্ধ করে ১৩৪ পৃষ্ঠায় যে প্রশ্নগুলি দেওয়া আছে তার মধ্যে কতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার দেখ দিকি ? সবগুলি পারলে তোমার স্মৃতিশক্তি খুব প্রবল বলে জেনো। পনরোটা পারলে মাঝামাঝির চেয়ে বেশী, দশটা অবধি পারলে মাঝামাঝি, আর তার চেয়ে কম পারলে তোমার মনে রাখার ক্ষমতা একটু কম আছে বুঝতে হবে।

নিজে বাঁচো, অপরকে বাঁচাও

আরতি ঘোষ

এমনি ভাবে বসে আছ কেন ?

—"খোকা, তুমি এমনিভাবে বসে আছ কেন ?"

খোকা নিরুত্তর। কিছুই সে বললো না।

ভদ্রলোক আবারও তাকে জিজ্ঞেস করেন, "কি হয়েছে তোমার ? এমন মনমরা হয়ে বসে আছ কেন ?"

খোকা এবারেও কিছু বলে না। কথা কইতে গেলেই বুঝি ব্যথায় সে ভেঙে পড়বে !

ভদ্রলোক বুঝতে পারেন তার অসহায় অবস্থা। সহানুভূতিতে তিনি অভিভূত হয়ে যান। তিনি বলেন, "খোকা, এমনিভাবে বসে থাকতে নেই। মনে রেখো, এ হচ্ছে ইটালীর রাজধানী রোম শহর। এখানে এভাবে বসে থাকা মানে, বিপদ্ ডেকে আনা। এপথে যারা চলাফেরা করে, সকলেই তারা ভদ্রলোক নয়। এদের মাঝে কত যে চোর-বদমাশ আছে, কে তার হিসেব রাখে ?

তাই বলছি খোকা, উঠে পড়ো। হয় বাড়ি চলে যাও, নয়তো এই বেলা কোথায়ও আশ্রয় নাও। কে আছেন তোমার ? মা বাবা, কেউ আছেন কি ?"

খোকা এবার কথা বলে। সে বললো, "মা আছেন আর দাদা আছেন।"

"তাহলে বাড়ি যাও না কেন ? এখুনি রাত হবে। যাও, এই বেলা বাড়ি চলে যাও।"

খোকা বলে, "না, আমি আর বাড়ি যাব না।"

"বাড়ি যাবে না? কেন? কেউ কি মেরেছে তোমায়?" ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন।

খোকা বললো, "হ্যাঁ, দাদা আমায় বড্ড মেরেছে, আমায় বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে আমি পড়া করিনি বলে। কাজেই আমিও স্থির করেছি আর বাড়ি যাব না। যা হয় হবে।"

"ছিঃ! ও কথা বলতে নেই।" ভদ্রলোক তাকে আশ্বাস দেন। তারপর বলেন, "দাদা বা মায়ের সঙ্গে কি বেশীক্ষণ রাগ করে থাকতে হয়? চলো, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।"

ছেলেটি এবার উঠে দাঁড়ালো। বললো সে, "না, আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। আমি কিছুতেই আর বাড়ি যাব না।"

ভদ্রলোক কি একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, "তাহলে এক কাজ করো না কেন? তুমি আমার বাড়ি চলো। আমার ছেলেপিলের সঙ্গেই থাকবে, তাদের সঙ্গেই লেখাপড়া করবে! কেমন? রাজী আছ?"

ছেলেটি বিস্ময়ে অবাক্! সে তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

ভদ্রলোক আবারও বলেন, "কেমন খোকা? রাজী তো? তাহলে চলো আমার সঙ্গে।"

ছেলেটি আর কথা বললো না। সে নিঃশব্দে তাঁর দিকে এগিয়ে এলো।

ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন, তাঁর এই ব্যবস্থায় ছেলেটি সম্মত হয়েছে। তিনি তক্ষুনি ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলেন, "ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!"—

ট্যাক্সি এসে গেলো। ভদ্রলোক গাড়ির দরজা খুলে, ছেলেটিকে ইশারায় ভিতরে যেতে বলে দিলেন।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে অনেকক্ষণ। ছেলেটির মনে হলো, পথের বুঝি আর শেষ নেই! একসময় ব্যস্ত হয়ে সে জিজ্ঞেস করলো, "আর কতদূর যাবেন? কোথায় আপনার বাড়ি?"

ভদ্রলোক কিছু বললেন না; একটুখানি হাসলেন মাত্র।

ছেলেটির মনে সন্দেহ হলো। তবু সাহস করে আবারও সে বললো, "না সার, আমি যাব না। আমায় নামিয়ে দিন, আমি আর যাব না।" এই বলে সে চলতি গাড়িতেই উঠে দাঁড়ালো।

ভদ্রলোক জোরে তাকে একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে বসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ধমকের স্বরে তাকে বললেন, "কোথায় যাচ্ছ? তুমি পালাবে কোথায়? কার হাতে পড়েছ, তা এখনো বুঝতে পারোনি? বুঝবে আর ঘণ্টাখানেক পরেই।—"

ফিলিপিনোকে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। [পৃষ্ঠা ১৩২

ড্রাইভার এই সময় পেছনে আরোহীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তাহলে সেই জাহাজ-ঘাটেই যাবো তো?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।"

সঙ্গে সঙ্গে ট্যাক্সির মুখ ঘুরে গেল। সোজা পশ্চিম দিকে চলতে শুরু করলো।

ছেলেটি বুঝলো, ট্যাক্সি চলছে স্টিমার-স্টেশনের দিকে। মনে তার ভয় হলো, তবে কি জাহাজে করে তাকে কোথাও পাঠিয়ে দেওয়া হবে?

ভয়ে সে কেঁদে ওঠে, আর মরিয়া হয়ে আবারও সে লাফিয়ে উঠলো। গাড়ি থেকে সে লাফিয়ে পড়বেই!

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঠাস করে একটা চড় এসে পড়লো তার গালের ওপর। কাতর চীৎকার করে ছেলেটি আবার তার সীটের ওপর লুটিয়ে পড়লো।

ছেলেটি বুঝলো, তার বাঁচবার আর কোন আশা নেই। সে নিশ্চয়ই কোন ছেলেধরার হাতে পড়েছে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে হয়তো সমুদ্রপথে চালান হয়ে যাবে!

একমাত্র কান্নাই তার সম্বল। অঝোরে সে কাঁদতে শুরু করে।

কতক্ষণ এমনিভাবে ছিল, তা সে জানে না। কিন্তু হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ট্যাক্সিখানা যেন কেঁপে উঠলো, সবাই তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে!

বিদ্যুদ্বেগে একখানি মোটর-বাইক এসে ট্যাক্সিখানাকে আঘাত করেছে। আর কেউ কিছু বুঝবার আগেই, মোটর-বাইকের আরোহী চলন্ত ট্যাক্সির মধ্যে লাফিয়ে পড়লেন!

সবাই সচকিত। কিন্তু বিস্ময় ও চমক না ভাঙতেই নবাগত বলিষ্ঠ লোকটি, ট্যাক্সির আরোহীকে তার নাম ধরে ডেকে বললেন, "ফিলিপিনো! আমি তোমায় চিনি। ছেলেমেয়ে চুরি করে, তাদের বিদেশে চালান দিয়ে খুব পয়সা করেছ, না? আজও নিয়ে পালাচ্ছিলে আর একটি শিকার! কেমন? আচ্ছা, আগে তার কিছু দক্ষিণা নাও বন্ধু!" বলেই তার নাকে-মুখে দমাদ্দম তিনি ঘুষি চালাতে লাগলেন।

ফিলিপিনো নিজেও একজন বলিষ্ঠ লোক। তা ছাড়া, সে নিজেও একজন 'বক্সার' বা মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু বক্সার টনী জোন্‌স্ তার দশগুণ বড় যোদ্ধা। কাজেই

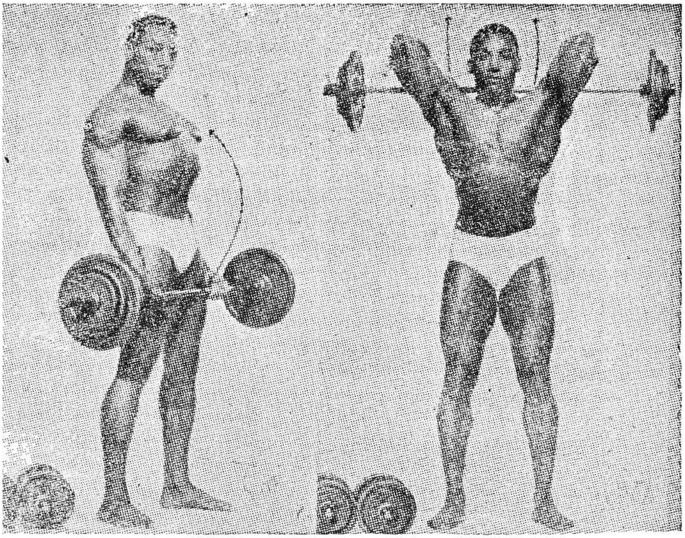

(ক) প্রথম ব্যায়াম (খ) দ্বিতীয় ব্যায়াম

দেখতে দেখতে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিলিপিনোর চেহারা হলো অতি ভয়াবহ !

ড্রাইভারকে টনী জোন্‌স্ একটা ধমক দিয়ে বললেন, "শয়তানের শাগরেদ আর এক শয়তান ! এবার ট্যাক্সি ফিরিয়ে নাও শহরের দিকে। জাহাজ-ঘাটে যেতে হবে না। ভাগ্যিস্ আমি দূর থেকে বাইনোকুলারে দেখতে পেয়েছিলাম যে ছেলেটার সঙ্গে এ লোকটার একটা খণ্ডযুদ্ধ হচ্ছে ! তা নইলে তো হতভাগা এতক্ষণে চালান হয়ে গিয়েছিল !"

যাহোক খানিক দূর গিয়ে টনী জোন্‌স্ একজন পরিচিত লোককে দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে থামতে বললেন। ড্রাইভার থামলে, তিনি ফিলিপিনোকে সেইখানে নামিয়ে দিয়ে পরিচিত লোকটিকে বললেন, "তুমি ভাই, এই বদমাশটাকে হাসপাতালে ভরতি করে দিয়ো। 'বক্সিং' খেলতে এসে এর কেমন অবস্থা হয়েছে দেখো !"

সে ফিলিপিনোকে ধরে নিয়ে এগিয়ে যায় হাসপাতালের দিকে।

তারপর কত মাস চলে গেছে ! টনী জোন্‌সের সঙ্গে ছেলেটির এখন মস্ত ভাব ! টনী জোন্‌সের সে একজন বিশ্বস্ত ভক্ত। প্রায় সারাদিন সে এখন তাঁর কাছেই কাটায়, তাঁরই সঙ্গে এখন তার কত কথা !

টনী জোন্‌স্ এখন মুষ্টিযোদ্ধা হলেও প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন শুধু একজন ব্যায়ামবীর। 'বক্সিং' শিখবার কল্পনাও তখন তাঁর মাথায় আসেনি।

ছেলেটি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শোনে আর তাঁর গত জীবনের অনেক কিছুর ফটো দেখে।

টনী জোন্‌স্ প্রথমে ব্যায়াম শুরু করেছিলেন স্যাণ্ডোর গ্রীপ্ ডাম্বেল নিয়ে, তারপর আরম্ভ করেন বার্‌বেল নিয়ে। টনী জোন্‌সের মতে বার্‌বেলের ব্যায়ামই দেহকে খুব তাড়াতাড়ি সুগঠিত করে তোলে।

দু'হাতে বার্‌বেল ধরে একবার নিচু থেকে ওপরে, আর একবার ওপর থেকে নিচুতে, এমনিভাবে কয়েকবার ব্যায়াম করা সংগত। টনী জোন্‌স্ বলেন, এইটাই হওয়া উচিত প্রথম ব্যায়াম (ক)।

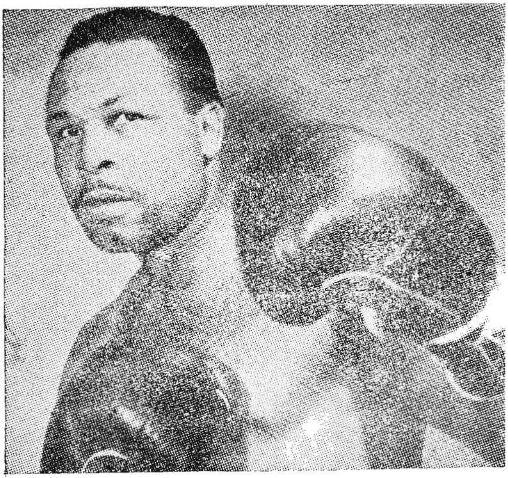

টনী জোন্‌স্‌ বক্সিং শিখছেন।

তাঁর দু' নম্বর ব্যায়াম কিছু কঠিন। সে হলো পেছনে ঘাড়ের কাছ থেকে বার্‌বেল নিয়ে ব্যায়াম করা। বার্‌বেল পেছন দিকে রেখেই একবার ওপরে ও একবার নীচের দিকে ওঠানামা করবে, এই হলো তাঁর উপদেশ। তিনি বলেন, এর ফলে বাহুর মাংসপেশী খুব পরিপুষ্ট হয়, আর বুকের প্রসারতা বেড়ে যায় (খ)।

এ ছাড়া, আরো নানারকম ব্যায়াম আছে। তার অধিকাংশই তাঁর নিজের আবিষ্কার। ছেলেটি টনী জোন্‌সের আবিষ্কৃত ব্যায়ামগুলি দেখে, আর দেখে তাঁর সুপুষ্ট মাংসপেশী ও তার মৃদু হিল্লোল!

ছেলেটির উৎসাহ লক্ষ্য করে টনী জোন্‌স্‌ তাকেও ব্যায়াম শেখাতে শুরু করেছিলেন।

ছেলেটি তাঁকে একদিন প্রশ্ন করে, "আচ্ছা, বার্‌বেল যদি এতই উপকার করে, তাহলে আর বক্সিং শিখবার দরকার কি? আপনি বার্‌বেল ছেড়ে বক্সিংএর লাইনে এলেন কেন?"

টনী জোন্‌স্‌ বলেন, "তারও একটা কারণ আছে। লিভারপুল্‌ বন্দরে একদিন দেখেছিলেম, একটা ষণ্ডা মাতাল সাহেব যাকে তাকে মারধোর করে চলছে। কেউ তাকে বাধা দিতে পারছিল না।

হঠাৎ দেখি, কোত্থেকে ছুটে এলো একটা রোগাটে ছোকরা! সে এসেই, আর কোন কথা না বলেই এগিয়ে গেলো ঐ ষণ্ডা মাতালটার কাছে।

মাতালটা তেড়ে এলো তার দিকে। কিন্তু একটু কাছে সে আসতেই ঐ ছোকরা ঝাঁ করে এমন একটি ঘুষি মারলো মাতালটার মুখের ওপর যে, সে তো অমনি কুপোকাত!

তারপরেও মাতালটা উঠে দাঁড়িয়েছিল একবার। আর ছোকরাকে মারবার চেষ্টাও সে করেছিল। কিন্তু ছোকরা সঙ্গে সঙ্গে আর গুটিকয়েক ঘুষি ঝাড়তেই সে একেবারে ঠাণ্ডা!

চোখের সামনে এমন একটা ব্যাপার দেখে আমারও যেন চোখ খুলে গিয়েছিল! বুঝলুম, শুধু ব্যায়ামে আত্মরক্ষা বা বিপৎকালে কাউকে সাহায্য করা, সব সময় সম্ভব হতে পারে না। তার সঙ্গে বক্সিং শেখাও প্রয়োজন।

তাই আমি আজ বক্সার টনী জোন্‌স্‌। আর বক্সিং শিখেছিলাম বলেই তোমাকে

একদিন অতবড় দুর্ধর্ষ ফিলিপিনোর হাত থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। সেদিনের সে কথা আজও মনে আছে তো খোকা ?"

"হ্যাঁ, তা আর বলতে ?" খোকা এই বলে একটু থেমে আবার বললো, "ভগবান্ সেদিন আপনাকে জুটিয়ে না দিলে, আমি আজ কোথায় থাকতাম ? ওঃ, সেকথা ভাবতেও আমার শরীর শিউরে ওঠে !"

কথা বলতে বলতে কৃতজ্ঞতায় তার চোখ দুটি বুঝি জলে ভরে ওঠে !—

প্রত্যেকটি বাঙালী ছেলের আজ বক্সিং শেখা দরকার। বক্সিংএর মত আর-একটি অতি-প্রয়োজনীয় ব্যায়াম আছে! তার নাম 'যুযুৎসু'। বারান্তরে সে কথা বলার ইচ্ছা রইলো।

---

১২৮ পৃষ্ঠায় দেওয়া ছবি থেকে
প্রশ্ন

১২৮ পৃষ্ঠায় যে ছবি আছে সেইটি দেখে বইটি বন্ধ করে নীচের প্রশ্নের কতগুলি উত্তর দিতে পার দেখ দিকি। যদি সব পার তা'হলে তোমার মত দৃষ্টিশক্তি ও মনে রাখার ক্ষমতা খুব কম লোকের আছে বলে জানবে।

(১) কটার সময়ে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ?
(২) দুর্ঘটনার দিন কোন্ তারিখ ছিল ?
(৩) সেই রাস্তা দুটির নাম কি যাদের সংযোগ-স্থলে দুর্ঘটনা ঘটেছে ?
(৪) আহত ব্যক্তি পুরুষ না নারী ?
(৫) লরীটা কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছিল ?
(৬) লরীটার মালিকের নাম কি ?
(৭) সেই মালিকের টেলিফোন নম্বর কত ?
(৮) তার ঠিকানা কি বলতে পার ?
(৯) সেই কোম্পানির ব্যবসা সম্বন্ধে কি কিছু জানা আছে ?
(১০) সেই লরীর নম্বর কত ?
(১১) লরীটা কি কোম্পানির অফিসের দিকে যাচ্ছিল ?
(১২) যখন দুর্ঘটনা হয় কত লোকে তা দেখেছে বলে মনে হয় ?
(১৩) তখন আর সকলে কি করছিল
(১৪) গাড়ির চালক কি দুর্ঘটনা ঘটতে দেখেছে ?
(১৫) রাস্তার ঠিক কোণে যে দোকান আছে সেটা কিসের দোকান ?
(১৬) এই দোকানের মালিকের নাম কি ?
(১৭) সেই দোকানের গায়ে কত নম্বর লেখা আছে ?
(১৮) L. H. Metzএর ঠিকানা কি ?
(১৯) সে কি জিনিস বিক্রি করে ?
(২০) Metzএর ডানদিকে কি দোকান আছে ?
(২১) এই ডানদিকের দোকানের মালিকের নাম কি ?
(২২) কোন্ দিকে তখন লরীটা যাচ্ছিল ?
(২৩) রাস্তার উপর দাঁড় করান জলের কলটা কোন্ জায়গায় আছে ?
(২৪) ছবিতে চিঠি ফেলার কোন বাক্স আছে কি ?
(২৫) দমকল ডাকবার বাক্সটা কোথায় ?
(২৬) কোণের বাড়িটার পরে ডানদিকে কিসের বাড়ি আছে ?

[উত্তর ঠিক হল কিনা ছবির সঙ্গে মেলালেই বুঝতে পারবে।]

মানুষ জাগাল যারা

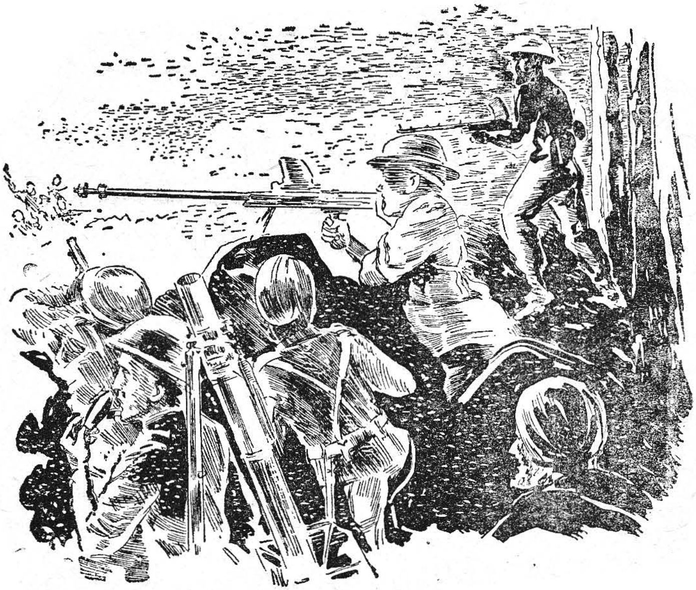

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

●

আগুন একদিন জ্বললই। দুর্দান্ত নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সেই আগুন প্রথম জ্বলল যশোরের চৌগাছা গ্রামে। আর সেই আগুন জ্বালালেন চৌগাছার বিশ্বাসেরা—বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর বিশ্বাস। তাঁদের কীর্তিকথা শোনবার মত, শোনাবারও মত।

কপোতাক্ষীর পুব পারে চৌগাছা গ্রাম।

চৌগাছার বিশ্বাসবাড়িতে আজ মহা ধুমধাম। প্রকাণ্ড উঠোনের পরেই সারি সারি খড়ের ঘর, চণ্ডীমণ্ডপ, তুলসীমঞ্চ। ঘরের দরজায় দরজায় মঙ্গলঘট, আমের শাখা। উঠোনের সামনে রাঙচিতার বেড়ার ধারে ধারে কাঠটগর আর শ্বেতকরবীর ঝাড়। খামারবাড়ির আমতলায় একটা ঘেরা জায়গায় ভিয়েন হচ্ছে। লুচি ভাজার চমৎকার একটা গন্ধ উঠেছে চারদিকে।

তকতকে উঠোনে লাল শামিয়ানা টাঙানো। তার নীচে ঘুরছে গ্রামের চাষাভুষোরা। বাঁধানো রকের ওপর একখানা চৌকিতে বসে আছেন দু'ভাই—বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর। হাসি হাসি মুখ বিশ্বাসমশাইদের। আজ যে তাঁদের বড় আনন্দের দিন। পরাধীনতার শিকল ছিঁড়ে আজ যে তাঁরা মাটির মানুষদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। আনন্দের ভাগ নিতে সারা চৌগাছার মানুষকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কাঠগড়া কন্সার্নের নীলকুঠিতে অনেক বছর দেওয়ানি করেছেন। অর্থ পেয়েছেন, পেয়েছেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা, কিন্তু তৃপ্তি পাননি। অসহায় চাষীদের ওপর কুঠিয়াল সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার মুখ বুজে অনেককাল সহ্য করেছেন। কিন্তু সহ্যের সীমা ছাড়াতেই দু'ভাই দাসত্ব ছেড়ে গ্রামে ফিরে এসেছেন। দুর্বল মানুষগুলোও আজ তাদের নেতা পেয়েছে।

বেলা বাড়তেই শামিয়ানার নীচে সারি সারি বসে গেছে গাঁয়ের লোকেরা—ছেলে বুড়ো

সকলে। গায়ে জামা নেই, পরনের কাপড় ময়লা, পা-ভরতি ধুলো। কলাপাতায় পর পর পরিবেশন করা হচ্ছে লুচি, ছোলার ডাল, শাকভাজা, কুমড়োর ঘণ্ট, মাছের কালিয়া। তারপর চাটনি, দই আর রসে ভরা বোঁদে। পরম আনন্দে খাচ্ছে বুভুক্ষু মানুষগুলো—এমন ভোজ অনেককাল তাদের কপালে জোটেনি।

রক থেকে নেমে সামনে এসে দাঁড়ালেন দু'ভাই। দু'চোখ ছলছল করে উঠল—কত সামান্যে তুষ্ট এরা। অথচ এরাও মানুষ, এদেরও এককালে জমি ছিল, নিজস্ব হাল-গরু ছিল, সচ্ছল না হলেও ছিল শান্তির সংসার। আর আজ এরা নিজেদের দেশেই উদ্বাস্তুর মত পরের করুণা ভিক্ষা করছে!

দু'চোখ জ্বলে উঠল বিশ্বাসদের—ওই মানুষগুলোর ভাঙা বুকে জাগাতে হবে আশা, ভাবহীন ওই সব চোখে লাগাতে হবে স্বপ্নের কাজল, ভাষাহীন মুখে ফোটাতে হবে সরব প্রতিবাদ। প্রথম জাগবে চৌগাছা, আর জাগার সেই ঢেউ ছড়িয়ে পড়বে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

আজকের এই উৎসব তাই আনন্দের উৎসব—জাগরণের উৎসব।

বাবুরা সামনে এসে দাঁড়াতেই মানুষগুলো খাওয়া বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল, তারপর লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিল।

—"লজ্জা কিরে, কী নিবি বল? দই, বোঁদে—?"

যে লোকটার হাতে দইয়ের ভাঁড়টা ছিল, তাকে কাছে ডাকলেন বিষ্ণুচরণ। ভাঁড় থেকে নিজের হাতে খুরি করে দই ঢেলে দিলেন দু'চারজনের পাতে।

—"খা রে তোরা, পেট ভরে খা—লজ্জা করিস না। জানি রে জানি, তোদের কষ্ট আমি জানি। দু'বেলা পেট ভরে খেতেই পাস না তোরা। নীলের দাদন নিয়ে দুটো কাঁচা পয়সা পাবার লোভে সাদা শয়তানদের পায়ে সর্বস্ব দিলি—এমন ভুল কেন করলি, ভাই?"

লোকগুলোর মাথা আরও ঝুঁকে পড়ল পাতের ওপর।

—"কষ্টের ভাত ছিল তোদের, কিন্তু সে ভাত ছিল সুখের ভাত। তাও আজ তোরা পাস না। একি আমার কম দুঃখ রে!"

একটু থেমেই আবার বলে উঠলেন বিষ্ণুচরণ—"কিন্তু এমন অনাহারে আর কতদিন কাটাবি, মুখ বুজে এই অত্যাচার আর কতদিন সইবি? তোরাও তো মানুষ, কতদিন আর পড়ে পড়ে মার খাবি? দয়া চাস না, ভিক্ষা চাস না—তোদের নিজেদের জিনিস তোরা সহজে না পাস, জোর করে কেড়ে নে।"

দূর থেকে জায়গাটা মনে হয় নিঃশব্দ, নির্জন আর রহস্যময়। বাবলা আর বাঁশঝাড়ের আড়ালে ঢিবিমত জায়গাটা—ফণিমনসা আর শিয়ালকাঁটার ঝোপে ভরা। সাহস করে একটু এগিয়ে

গেলেই শ্যাওড়া আর ভাঁটজঙ্গলের পরে খানিকটা ঢালু জমির নীচে মাটিলেপা পরিষ্কার একটা উঠোন—বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। উঠোনের একধারে মাঝারি একটা চালাঘর। এখানেই চৌগাছার নতুন আখড়াখাড়ি খুলেছেন বিশ্বাসেরা। অনেকদিনের ধূমায়িত আগুন যে চৌগাছাতেই প্রথম জ্বলবে তারি গোপন প্রস্তুতি চলেছে এখানে। বিশ্বাসেরা বরিশাল থেকে লাঠিয়াল আনিয়েছেন, দেশের চাষাভুষোকে লাঠি ধরিয়েছেন। দেশের মান, দেশের সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে তাদের যে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে হবে, শক্তের সঙ্গে শক্তি দিয়ে লড়তে হবে, লাঠি দিয়ে প্রতিহত করতে হবে লাঠির আঘাত।

সকালে আসেন বিষ্ণুচরণ, বিকেলে আসেন দিগম্বর। অর্থ দেন, নির্দেশ দেন, উৎসাহ দেন। চালাঘরে জমা হয় লাঠি-সড়কি, বর্শা-বল্লম আর কাঁড়বাঁশ। উঠোনে জোয়ানদের লাঠি চালানো আর বর্শা-বল্লম ছোঁড়ার রকমারি কায়দা শেখায় বরিশালের মুসলমান লাঠিয়ালেরা।

কাঠগড়া কন্‌সার্নের বিরাট কুঠিবাড়ির সুসজ্জিত প্রমোদকক্ষে যখন হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলো জ্বলে, ইংরেজ কুঠিয়ালদের নীল নীল চোখে ঘনায় অর্থের লালসা, মিষ্টি বাজনার রেশ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে, বাইরের বাগিচার লতাকুঞ্জে এসে পড়ে দু'চারটে তীক্ষ্ণ আলোর ছটা, বাবুর্চীখানায় ওঠে সুখাদ্যের খোশবায়, বাজনার তালে তালে আস্তাবলে পা ঠোকে ঘোড়ারা, তখন অন্ধকারে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান বিশ্বাসেরা। গরিব চাষাদের দাওয়ায় বসে শোনান তাদের দুর্ভাগ্যের কাহিনী, ঘুম-ভাঙানিয়া মন্ত্রে জাগিয়ে তোলেন ঘুমন্ত মানুষগুলোকে—পথের নিশানা দেখান।

চরম দিনটির অপেক্ষায় থাকেন বিশ্বাসেরা, অপেক্ষায় থাকে চৌগাছার মানুষেরা।

-

সেবার বর্ষা নামতেই গ্রামের বাইরে ধুধু-করা মাঠ প্রথম যখন সরস হল, চৌগাছার চাষীরা তখন লাঙল নিয়ে মাঠে নামল। আলের ওপর দাঁড়িয়ে দু'চোখ ভরে দেখলেন বিশ্বাসেরা। আকাশে কালো মেঘের আড়ম্বর, বাতাসে ভিজে মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ। মেঘে-ঢাকা এই আকাশের নীচে বিদ্রোহের প্রথম পাঠ নিল চৌগাছার মানুষেরা। অনেককাল পরে জমিতে আজ নীলের বদলে আউশ ধানের বীজ ছড়াল।

চাষীদের এই নিয়মভঙ্গের খবর চৌগাছার নীলকুঠিতে পৌঁছতেই ছুটে এল কুঠিয়ালের লোকজন—দেওয়ান রাইরতন, গোমস্তা, তাগিদগীর আর পোষা লাঠিয়ালেরা।

—"নীল বুনবি বলে কুঠি থেকে দাদন নিয়েছিস ব্যাটারা, ধানের চাষ দিচ্ছিস কোন্ মুখে ?"

একসঙ্গে গর্জে উঠল চাষীরা—"দাদন দিয়ে মাথা কিনেছ, সরকারবাবু ? প্রাণ থাকতে আমরা আর নীল বুনব না—খবর দাওগে তোমার হুজুরকে।"

—"নীল বুনবি না—বড় যে বুকের পাটা তোদের ! লারমুর হুজুরের লাঠির গুঁতোয় মোল্লাহাটির গোঁয়ার চাষীদের হাল শুনেছিস তো ? তেমনি হাল হবে তোদের, মনে রাখিস।"

লাঠিয়ালদের ইঙ্গিত করতেই রাইরতনের দিকে এগিয়ে এলেন দু'ভাই—"মিথ্যে এদের লাঠির ভয় দেখাচ্ছ, রাইরতন। দিন পালটেছে, মানুষও পালটেছে। লাঠি আজ আর শুধু একা কুঠিয়ালের নেই, চৌগাছারও আছে।"

—"তোমরাই তাহলে এই হারামজাদাগুলোকে ক্ষেপিয়েছ, বিষ্টু বিশ্বেস?"

—"আমরা ক্ষেপাইনি, ক্ষেপিয়েছে অত্যাচারী কুঠিয়ালেরা, ক্ষেপিয়েছ তোমরা, তাদের তাঁবেদারেরা। তোমরা মানুষ নও রাইরতন, শয়তান। জাল, জোচ্চুরি আর অন্যায় চক্রান্ত করে তোমরাই দেশের মানুষের সর্বনাশ করেছ।"

—"মুখ সামলে কথা কও, বিশ্বাস। প্রাণের ভয় থাকলে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও। অবাধ্য বেইমানগুলোকে শায়েস্তা করে দিয়ে যাই।"

হোহো করে হেসে উঠলেন বিষ্ণুচরণ—"চোখ রাঙাও কাকে, রাইরতন? আমি তোমার আমলা গোমস্তা নই। সাদা হুজুরদের অনেক বুটের ঘা হজম করেছ, দেওয়ানজী—দেশী মানুষদের ধুলোপায়ের লাথি খেয়ে মান খুইয়ো না, সরে পড়। চৌগাছার মহামান্য হুজুরকে বল, চৌগাছার চাষীরা আর কোন দিনও নীল বুনবে না। তারাই হবে নীলকুঠির মালিক—সেদিন আসছে। কুঠির উঠোনে যেদিন বসবে যাত্রার আসর, জমবে কবিগানের লড়াই সেদিন তোমারও নিমন্ত্রণ রইল দেওয়ান বাহাদুর।"

লোকজন নিয়ে কুঠিবাড়িতে ফিরে গেল রাইরতন—জোড়হাতে হুজুরের দরবারে সমস্ত নিবেদন করল। কাঠগড়ার বড় কুঠিতে তক্ষুনি রওয়ানা হয়ে গেলেন কুঠিয়াল সাহেব। চৌগাছার বিদ্রোহী রাইয়তদের শায়েস্তা করার জন্যে জরুরী ব্যবস্থার প্রয়োজন।

সেদিন সন্ধ্যার অন্ধকারেই তিনশো লাঠিয়াল নিয়ে কুঠিবাড়ি আক্রমণ করলেন বিশ্বাসেরা। কুঠির চৌবাচ্চা ঘর, জ্বাল ঘর, কুঠিয়ালের বাংলো, আপিস, আস্তাবল, বাবুর্চীখানা সমস্তই দখল করল চৌগাছার কৃষকবীরেরা। শুকনো নীলগাছগুলোয় আগুন জ্বালিয়ে দিল, কপোতাক্ষীর জলে ডুবিয়ে দিল জল পাম্প করার বিরাট ইঞ্জিনটা, কুঠিয়ালের শখের বাগানের ফুলগাছগুলো উপড়ে ফেলতে লাগল নীল-পচানোর বড় বড় চৌবাচ্চায়, পোষা ঘোড়াগুলোকে তাড়িয়ে দিল অন্ধকারে।

বাংলোর বৈঠকখানায় দামী কার্পেটের ওপর ধুলোপায়েই বসল চাষাভুষোরা। মশালের আলোয় বিজয়ীর গর্বে চকচক করছে তাদের মুখগুলো।

উঁচু একটা টুলের ওপর উঠে দাঁড়ালেন দিগম্বর—"এই কুঠিবাড়ি চৌগাছার মানুষদের হল এতদিনে। কিন্তু এইখানেই এর শেষ নয় ভাই, লড়াইয়ের এই সবে শুরু। বিদেশী ইংরেজ সহজে ছাড়বে না এখানকার রাজ্যপাট,—আবার ওরা আসবে, তৈরী হয়েই আসবে। তোরাও তৈরী থাকিস। হাওয়া বইছে তোদের দিকে, জয় তোদের হবেই—এ বিশ্বাস আমার আছে।"

ভোর হতেই ছুটে এল নীলকরের বিরাট বাহিনী। কপোতাক্ষী পার হয়ে চৌগাছায় ঢুকল হাজারের ওপর মানুষ—বিদ্রোহী চৌগাছা গ্রামকে তারা ধুলোয় মিশিয়ে দেবে, চরম শিক্ষা দেবে খুশী খুশী মানুষগুলোকে।

গ্রামে ঢোকবার মুখেই বাধা দিল চৌগাছার তিনশো লাঠিয়াল। ঝনক দিয়ে উঠল বর্শা-বল্লম, লাঠি-সড়কি।

জীবন পণ করে সমস্ত দিন লড়ল চৌগাছার বীরেরা। বন্দুকের সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দাঁড়াল, রক্ত দিল, প্রাণ দিল, কিন্তু জয়ী হতে পারল না।

সন্ধ্যা হতেই নীলকরের বিজয়ী বাহিনীকে পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানির বিজয়-পতাকা আবার উড়ল চৌগাছার কুঠিবাড়িতে।

আখড়াবাড়ির উঠোনে চাপ চাপ অন্ধকার। দাওয়ার ওপর হেঁটমুখে বসে আছেন বিষ্ণুচরণ আর দিগম্বর, উঠোনে বসে আছে অনেকগুলো নির্বাক মানুষ। বিশ্বাসেরা ভাবছেন—চৌগাছার মানুষদের তাঁরা জয়ের গৌরব দিতে পারলেন না, তাঁদের বড় সাধের স্বপ্ন সার্থক হল না। পরাধীন মানুষগুলোর মুক্তির দিন বুঝিবা আরও পেছিয়ে গেল।

শ্যাওড়া আর ভাঁটজঙ্গলে খসখস শব্দ হতেই মুখ তুলে তাকালেন তাঁরা, সচকিত হয়ে উঠল উঠোনের মানুষেরা।

একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়াল বিশ্বাসদের সামনে।

—"কী খবর, ভাই ?"

—"কুঠিয়ালের লোকেরা সারা গাঁ তোলপাড় করে আপনাদের দু'জনের খোঁজ করছে কত্তা। পালিয়ে যান আপনারা, আর একদণ্ডও এখানে থাকবেন না।"

চেঁচিয়ে উঠলেন দু'ভাই—"পালিয়ে যাব, চোরের মত গা-ঢাকা দিয়ে পালাব আমরা ? আমাদের প্রাণের দাম আছে, তোদের নেই ? তোরা মরতে পারিস, আমরা পারি না ?"

এতক্ষণে উঠোনের নির্বাক মানুষগুলোর মুখে কথা ফুটল—"আপনারা চলে যান, বাবু। আপনাদের দু'জনের প্রাণের দাম যে আমাদের মত হাজার চাষীর প্রাণের চেয়েও বেশী। মরেও ঠিক বেঁচে থাকব আমরা। দুঃখ কষ্ট অনেক সহ্য করেছি, আরও না হয় সহ্য করব।"

খানিকক্ষণ ভাবলেন দু'ভাই, তারপর বললেন—"বেশ, তবে তাই হোক। আজ আমরা যাচ্ছি, তোরা থাক। বুকের আলো নেভাস না তোরা, অপেক্ষায় থাকিস, আমরা আবার আসব, আবার আগুন জ্বলবে।"

সেদিন রাত্রের অন্ধকারে বাছা বাছা ক'জন লাঠিয়াল নিয়ে চৌগাছা ছাড়লেন বিশ্বাসেরা। কুঠিয়ালেরা তাঁদের ধরতে পারল না।

ডুম ডুম ডুম···ডুম ডুম ডুম···

গ্রাম জাগে, মানুষ জাগে।

গ্রামের পর গ্রাম। ছোট ছোট কুঁড়ে, ঝোপঝাড়, বাঁশবন, পানাপুকুর আর ডোবা। সন্ধ্যা হলেই কুঁড়েয় ঢোকে মানুষেরা,—বাইরে শেয়াল ডাকে, ব্যাঙ আর ঝিঁঝির তান ওঠে, জোনাকি ওঠে অন্ধকারে।

গ্রামে গ্রামে কিন্তু মানুষ ঘুমোয় না—কান পেতে শোনে তারা বিশ্বাসদের ডাক আসে কখন। কুঁড়ের আগড় খুলে মেঘে-ঢাকা আকাশের দিকে তাকায়—বৃষ্টি হয়ত নামবে, ক্ষেত ভরবে বর্ষার জলে। কিন্তু চাষী-মানুষদের চাষের সুযোগ মিলবে কি?

ভগবানকে নালিশ জানায় তারা—দুঃখের রাত্রির শেষ হবে কি, ভগবান?

রাত্রির সমস্ত নিস্তব্ধতা ভেঙে যায় ঢেঁটরার আওয়াজে—

ডুম ডুম ডুম···ডুম ডুম ডুম···

আশার আলো জ্বলে ওঠে অসহায় মানুষগুলোর চোখে। কুঁড়ের আগড় খুলে ছোটে তারা গ্রামের সীমানায়—বিশ্বাসেরা এসেছেন, ডাক এসেছে তাঁদের।

গ্রামের সীমানায় ঝুরিনামা বটগাছতলায় জ্বলে ওঠে মশালের আলো। গাছতলায় জমা হয় গ্রামের চাষী-মানুষ।

উঠে দাঁড়ান বিষ্ণুচরণ—"ভয় পাস না তোরা। তোদেরও মুক্তির দিন আসছে। চৌগাছা জেগেছে, তোরাও জাগ। প্রাণের ভয় করিস না। মরবার আগে বিদেশী অত্যাচারীর অত্যাচারের শাসন ভেঙে চুরমার করে দে। অনেক সহ্য করেছিস তোরা, আজ শেকল-ভাঙার দিন এসেছে···"

—"কী করব আমরা,—বলে দিন, হুজুর!"

হেসে উঠলেন দিগম্বর—"হুজুর! আজ আর হুজুর নই তোদের, তোদের ভাই। তোদের পাশে দাঁড়িয়ে তোদের আমরা মুক্তির পথে নিয়ে যাব, তোরা আমাদের শক্তি দে। ইংরেজ বণিকদের তাড়িয়ে মাটি আবার তোদের হবে, আবার সোনার ফসলে ভরবে তোদের ক্ষেত-খামার, শান্তি আসবে, সুদিন আসবে তোদের ভাঙা কুঁড়েয়।"

একটু থেমেই আবার বললেন—"নীল বোনা বন্ধ করে দে। কুঠিয়ালদের লাঠির সামনে তোরাও লাঠি হাতে দাঁড়া। প্রাণ দেবার আগে প্রাণ নে। এ তোদের বিদ্রোহ নয়,—এ তোদের মানুষ হয়ে বাঁচবার অধিকার, এ তোদের মুক্তির লড়াই···"

এমনি করেই জাগল গ্রামের পর গ্রাম। আগুন ছড়াল কাঠগড়া কন্সার্নের কুঠিতে-কুঠিতে। প্রজারা জমিতে নীল বুনল না, দাদনের টাকাও শোধ দিল না। ১৮৫৯ থেকে ১৮৬০—এই দুটো বছরের মধ্যেই কাঠগড়া কন্সার্ন বন্ধ হয়ে গেল, আর খুলল না। সাহেব কুঠিয়ালদের কুঠিবাড়ি-

গুলোর কার্নিসে কার্নিসে বাসা বাঁধল রাজ্যের যত পাখি, আলসেয় আলসেয় গজাল বট আর অশ্বথের চারা, অন্ধকার ঘরগুলোয় ধুলোর রাশি আর মাকড়সার জাল, ফোকরে ফোকরে বাদুড় আর চামচিকের নিশ্চিন্ত রাজত্ব। চোরকাঁটা আর বুনো ঘাসে ভরে গেল নীলখোলার উঠোন, পুরু শ্যাওলা পড়ল নীল-পচানোর বিরাট চৌবাচ্চাগুলোয়, শখের ফুলবাগিচায় জন্মাল কালকাসুন্দী, কচুবন, ভাঁটজঙ্গল আর শিঁয়াকুলের অজস্র কাঁটাঝোপ।

সুখের রাজত্ব ছাড়বার আগে কিন্তু মরণ-কামড় দিতে ভুলল না বিদেশী বণিকেরা। বিদ্রোহী রাইয়তদের জোট ভাঙবার জন্যে লাঠির শাসন ছেড়ে আইনের আশ্রয় নিল তারা। নিঃস্ব মানুষগুলোর নামে রাজ-সরকারে মামলার পর মামলা রুজু করা হল। আমাদের এই হতভাগ্য দেশে বিশ্বাস-ঘাতকের অভাব কোনদিনই হয়নি, সেদিনও হল না। সামান্য অর্থের বিনিময়ে দেশের মানুষদের বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দিয়ে এল অনেকেই। আদালতের নিরপেক্ষ বিচারে অনেকের জরিমানা হল, অনেককে জেলে পাঠান হল।

বিশ্বাসেরা কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। প্রকাশ্যে এলেন না বটে, কিন্তু আড়াল থেকেই যথাসর্বস্ব ঢাললেন অসহায় মানুষগুলোর পেছনে। মকদ্দমার খরচ দিলেন, জরিমানার টাকা জমা দিলেন, শোধ করলেন দাদনের বকেয়া পাওনা। কেউ জেলে গেলে তার নিরাশ্রয় পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিলেন।

এমনি করেই সর্বস্বান্ত হলেন মানুষ দুটো। সঞ্চিত অর্থ গেল, গোলাভরা ধান গেল, বাড়ি গেল, জমিজমা সমস্তই গেল। তাঁদের এই নিঃস্বার্থ ত্যাগ কিন্তু দেশের মানুষ কোন দিনও ভুলল না।

আগুন নিভল না।

পুবদিক লাল, রোদ ওঠে ওঠে। কাপোতাক্ষীর সবুজ ঘাসে-ঢাকা তীরে এসে দাঁড়ালেন বিশ্বাসেরা। জলের ওপর হেলে-পড়া একটা বটগাছের নীচে তাঁদের নৌকো বাঁধা রয়েছে। মাঝী রাত থেকেই অপেক্ষা করছে তাঁদের জন্যে। ঐ নৌকো করে চলে যাবেন তাঁরা শহরের পথে। তাঁদের ব্রতের উদ্‌যাপন হয়েছে, নিশীথ পদযাত্রার অবসানে স্বপ্ন হয়েছে সার্থক। তাই সব কিছু পেছনে ফেলে আজ তাঁরা বিদায় নিচ্ছেন এখান থেকে। এবার তাঁরা শহুরে মানুষদের দরবারে পৌঁছে দেবেন এইসব চাষী-মানুষের মর্মকথা, এদের বেদনার ইতিহাস, এদের ত্যাগ আর বীরত্বের গৌরবগাথা।

নৌকোয় ওঠবার আগে শেষবারের মত পেছন ফিরে তাকালেন তাঁরা। বৃষ্টি-ধোয়া ভাদ্র আকাশের নীচে কাশবনে ভোরের হাওয়ার মাতামাতি···শিয়ালকাঁটার বনে হলুদ ফুলের সমারোহ··· বেগুনী রঙের বনকলমী ফুলে ছাওয়া ঝোপে প্রজাপতির আনাগোনা···সবুজ উলুবনে গাঙশালিকদের কলরব। সমস্তই অতি সাধারণ, ঘরোয়া—তবু আজ যেন সমস্তই নতুন রূপে দেখা দিয়েছে তাঁদের

মুগ্ধ চোখে। সামনের পায়ে-চলা ওই পথ সাপের মত এঁকেবেঁকে মাঠ বন ক্ষেত পার হয়ে মিশে গেছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। সেখানকার মাঠ আজ ঘন সবুজ হয়েছে নবীন আউশ ধানে—স্বপ্ন নেমেছে চাষীদের মনে। তাদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস এখান থেকেই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারছেন তাঁরা।

সর্বস্ব দিয়েও আজ তাই তাঁদের কোন ক্ষোভ নেই। যে আগুন তাঁরা জ্বেলে দিয়ে এসেছেন চৌগাছায়, সেই আগুন আজ ছড়িয়ে পড়েছে কাঠগড়া, খালিসপুর, গুয়াতলী, কাঁদবিলা, ইল্‌সামারি, আরও অনেক অনেক গ্রামে। এই বিশ্বাস নিয়ে তাঁরা যাচ্ছেন, ওই আগুন আর কোন দিনও নিভবে না, উদ্বাস্তু ভুখা মানুষদের যে বিদ্রোহ-মিছিলের যাত্রা হয়েছে শুরু, তার গতি আর কোন দিনও রুদ্ধ হবে না। আজকের এই আগুন কাঠগড়া কন্‌সার্নকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে মোল্লাহাটি, হাজরাপুর, সিন্দূরিয়া, জোড়াদহ, খড়গড়া, নহাটা, বাবুখালি, রামনগর আর মদনধারী কন্‌সার্নে। নীলকুঠির নীল-বাঁদরদের ব্যাঘ্র-শাসনের অবসান হবেই।

আজ যে নতুন সূর্য উঠেছে! আজ আর পথ দেখাবার প্রয়োজন নেই। পরম নিশ্চিন্তে নৌকোয় উঠলেন হু'ভাই। শেষ প্রণাম জানালেন মাটি-মাকে।

নৌকো ছেড়ে দিল দক্ষিণমুখে। সোনার রোদ্দুরে ততক্ষণ ভরে গেছে চারদিক্।

শ্রীসঞ্জয় সরকার, পি ১৩৬, সি. আই. টি. রোড, কলিকাতা-১০ হইতে তাঁর প্রিয় অ্যালসেসিয়ান কুকুর "পাপিয়া"র স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে শুকতারার মাধ্যমে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করতে চান। তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"পাপিয়া স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়-বস্তু ঃ

কোন গৃহপালিত কুকুর সম্বন্ধে কোন মৌলিক গল্প অথবা প্রবন্ধ।

বৈশাখ '৬৮ সংক্রান্তি পর্যন্ত রচনা গৃহীত হবে। ফলাফল আশ্বিন '৬৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। রচনার গুণানুসারে দুটি পুরস্কার দেওয়া হবে।

প্রথম পুরস্কার ১০৲ দ্বিতীয় পুরস্কার ৫৲

"সবার উপর মানুষ সত্য"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ দাস

স্বপ্ন নহে তো আর—
দুর্গম হিমালয়ের শীর্ষে মানুষ চরণ চিহ্ন
এঁকে দিল বার বার।
মহাশূন্যের পথে—
পাড়ি জমাইতে পাঠাল মানুষ আপন সৃষ্ট গ্রহ
পারমাণবিক রথে।
সাগরের তলদেশে—
কি আছে অজানা নহে তো আজিকে, মানুষ আপন চক্ষে
দেখে এল অবশেষে!
যন্ত্রের মাঝখানে—
ছায়া রূপে কায়া, সৌরভ আর যত জাগতিক শব্দ
মানুষ রাখিতে জানে।
ঊর্মি মালার মাঝে—
শুধু হাত পায়ে সাঁতার কাটিয়া চ্যানেল হইতে পার
মানুষেরই আজ সাজে।
মানুষ বুদ্ধিবলে—
প্রকৃতির যত রুদ্ধ দুয়ার খুলে দেবে একে একে
নানা কলে-কৌশলে।
সংশয় জাগে তবু—
"সবার উপর মানুষ সত্য" হবে এ কি চির সত্য
মানব জীবনে কভু?
সেদিন সত্য হবে—
আপন মনের রিপুরে মানুষ মহাপুরুষের মন্ত্রে
যবে জয় করে লবে।

নিশি রাতের আগন্তুক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

॥ ২ ॥

কলকাতা থেকে কিছু দূরে চুঁচড়ায়।

উক্ত ঘটনার দিন দুই পরের আর এক রাত্রি। রাত্রি তখন প্রায় সোয়া বারটা বাজে।

চুঁচড়ার গঙ্গার ধারে বহুদিনকার পুরাতন একটা ভাঙা বাড়ি। বহুকালের সংস্কারের অভাবে জীর্ণ হতে হতে বাড়িটা আজ এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে দেখলে মনে হবে বুঝি পোড়ো বাড়ি একটা।

দেওয়ালের পলেস্তারা খসে খসে পড়ছে, জায়গায় জায়গায় ইট বের হয়ে পড়ছে।

বাড়িটার হাত দশেক ব্যবধানে বহুদিনের পুরাতন একটা গির্জা।

গির্জাটা এককালে বোধ হয় পর্তুগীজরা তৈরি করেছিল। গির্জার সামনে অপরিসর একটা কাঁচা সড়ক, বরাবর গঙ্গার ধার পর্যন্ত চলে গিয়েছে।

সড়কের দু'পাশে ঝাউবীথি।

গঙ্গাও খুব দূর নয়। পাশাপাশি ঐ পোড়ো বাড়ি আর জীর্ণ গির্জা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়।

এদিকটায় ঐ পোড়ো বাড়ি ও গির্জাটা ছাড়া আর বড় একটা বাড়িঘর চোখে পড়ে না।

মানুষজনের বসতি নেই, অপেক্ষাকৃত নির্জন।

যে রাত্রির কথা বলছিলাম।

শীতের কৃষ্ণপক্ষের রাত। ঠাণ্ডাটাও পড়েছে তেমনি। যেন ছুঁচ বেঁধায়।

স্তব্ধপ্রায় মধ্যরাত্রে অদ্ভুত একটা কান্নার মতই যেন শোনাচ্ছে বাতাসে ঝাউগাছের সোঁসোঁ শব্দ।

সেই পোড়ো, জীর্ণ বাড়িটার মধ্যে।

মাঝারিগোছের একটা ঘরে অত্যন্ত জীর্ণ একটা সেকেলে পুরাতন পালঙ্কের উপরে ততোধিক জীর্ণ শয্যায় একটা জীর্ণ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে প্রৌঢ়া এক নারী।

ভদ্রমহিলার নাম মার্থা। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে নয় কিন্তু শরীর এমন ভাবে ভেঙে গিয়েছে যে দেখলে কত বয়েসই না হয়েছে বলে মনে হয়।

মাথার চুল পেকে সব প্রায় সাদা হয়ে গিয়েছে। গাল ভেঙে গিয়ে হনু দুটো চামড়া ঠেলে বেরিয়েছে। কোটরাগত চক্ষু।

ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় যে প্রাণীটি ছিল, বছর তের-চোদ্দর একটি অত্যন্ত সুন্দরী রোগা মেয়ে, জুলিয়া। মেয়েটির কটা চোখ, সোনালী চুল।

পরিধানে জীর্ণ মলিন একটি ফ্রক ও তার উপরে বহুদিনের পুরাতন জীর্ণ একটি শাল জড়ান।

মৃদুকম্পিত মোমবাতির স্বল্প আলোয় বসে বসে জুলি একমনে একটি জীর্ণ ফ্রক ছুঁচ-সুতো দিয়ে রিপু করছিল।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সামান্যই।

খান দুই জীর্ণ রংচটা স্টীলের ট্রাঙ্ক, একটা সেকেলে কাঠের কাবার্ড। কাবার্ডের উপরে কয়েকটি পুরাতন কাচের বাসনপত্র ও ছুরি চামচ।

কয়েকটি বিস্কুট মাখনের টিন।

দেওয়ালে একটি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর ছবি টাঙানো এক দিকে, অন্য দিকে সাঁটা একটি আরশি।

ঘরের এক কোণে ছোট একটা কাঠের চৌকির 'পরে একটা জলের কুঁজো, খান দুই ভাঙা স্টীলের চেয়ার ও ছোট একটি কাঠের টেবিল।

সমস্ত বাড়িটার মধ্যে বলতে গেলে ঐ একটি মাত্র ঘরই ব্যবহারযোগ্য, আর সব অব্যবহার্য হয়ে দীর্ঘ দিন ধরে পড়ে আছে।

ঘরের জীর্ণ জানালাপথে মধ্যরাত্রের হিম ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে এসে ঢুকছিল।

অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে মার্থা ডাকে, "জুলি।"

"মামি।"

সেলাই থেকে মুখ তুলে জুলিয়া শয্যায় শায়িতা মার্থার দিকে তাকাল।

"রাত কটা হলো?"

"একটু আগে থানার পেটা ঘড়িতে শুনেছিলাম বারটা বাজতে।"

গঙ্গার ধারেই কিছুদূরে থানা।

অন্য সময় স্পষ্ট না শোনা গেলেও রাত্রে চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়ে আসে ঢংঢং পেটা ঘড়ির শব্দটা স্পষ্টই শুনতে পায় জুলিয়ারা।

"তুমি এখনো ঘুমাওনি?" জুলিয়া প্রশ্ন করে মার্থাকে।

"তুই শুবি না ?" জুলিয়ার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে মার্থাই পাল্টে জুলিয়াকে প্রশ্ন করে।

"এই ফ্রকটা সেলাই করে তারপর শোব।"

তারপর কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে থাকে।

মধ্যরাত্রির স্তব্ধতায় অদূরবর্তী গির্জার ঝাউবীথির সোঁসোঁ করুণ কান্নার মত শব্দটা একটানা শোনা যায়।

ঘরের মধ্যে একটি মাত্র মোমবাতির শিখাটা থেকে থেকে কেঁপে ওঠে।

আবার কিছুক্ষণ পরে মার্থাই কথা বলে, "কলকাতায় আজ চ্যাটার্জীর ওখানে গিয়েছিলি না ?"

"হ্যাঁ।"

"দেখা হলো ?"

"না।"

"কেন ? বাড়িতে ছিল না বুঝি ? আজ তো রবিবার। রবিবারও বাড়ি ছিল না !"

"ছিল।"

"তবে ?"

"দেখা করলো না। চাকরের হাত দিয়ে দশটাকার একটা নোট পাঠিয়ে দিয়েছিল। নোটটা আমি নিইনি মামি, চাকরের হাতেই ফেরত দিয়ে এসেছি।"

"আশ্চর্য ! দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিল তোকে ?"

"হ্যাঁ, মামি। একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল উপরে ছুটে গিয়ে সেই নোটটা তাঁরই মুখের 'পরে ছুড়ে ফেলে দিয়ে আসি, কিন্তু পারলাম না।- নিজেই যেন ছুটে পালিয়ে এলাম।"

মার্থা কোন কথা বলে না, চুপ করে থাকে।

কথা বলতে বলতে জুলিয়ার চোখেও জল ভরে এসেছিল। দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল।

"জান মামি, আসবার সময় আমি ঝাউতলায় আমাদের 'লাকি কটেজ'টা একবার না দেখে আসতে পারিনি। দেখলাম দরজায় তালা দেওয়া রয়েছে।"

জুলিয়ার কথা শুনতে শুনতে মার্থার বুকটা কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে।

"ওসব পুরানো দিনের কথা ভেবে আর মন খারাপ কেন করিস জুলিয়া।" তার-পরই আর একটা দীর্ঘশ্বাস বুঝি মার্থার বুকটা কাঁপিয়ে বের হয়ে আসে এবং সে বলে, "কি দুঃখে যে সে আত্মহত্যা করলো। আমার আর কদিন, আমার ত দিন হয়ে এসেছে, তোকেই সে অকূলে ভাসিয়ে দিয়ে গেল—আমি চোখ বুজলে যে তোর কি হবে !"

"কী আবার হবে। আর নতুন করেই বা মন্দ কি আমার হবে। রাতারাতি

পথের ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছি কিন্তু তাতেও আমার কোন দুঃখ ছিল না মামি। দাদার মৃতদেহটাও যদি চোখে একবার দেখতে পেতাম।"

"সবই দুর্ভাগ্য রে! নইলে সে সময় আমরাই বা লক্ষ্ণৌ বেড়াতে যাবো কেন, আর ঠিকমত আমাদের হাতে টেলিগ্রামটাই বা পৌঁছাল না কেন?"

সত্যিই ব্যাপারটা করুণ।

মার্থা আর জুলিয়া লক্ষ্ণৌতে মাস দুইয়েকের জন্যে গিয়েছিল।

মার্থাকে অবিশ্যি তার ছেলেই জোরজার করে মাস দুইয়েকের জন্যে লক্ষ্ণৌতে পাঠিয়ে দিয়েছিল চেঞ্জে। চেঞ্জে গেলে যদি মার্থার শরীরটা ভাল হয়।

পেটের দুরারোগ্য ব্যাধিতে গত দীর্ঘ দেড় বৎসর ধরে ভুগছিল মার্থা। কষ্ট পাচ্ছিল। চিকিৎসার ব্যাপারে কলকাতার কোন ডাক্তারই বাদ যায়নি।

কিন্তু কিছুতেই কোন উপকার হয়নি।

মার্থা যেন দিন দিনই শুকিয়ে যাচ্ছিল, রুগ্ণ জীর্ণ হয়ে পড়ছিল।

মার্থা তবু ছেলের কথায় লক্ষ্ণৌয়ে তার ছোট বোনের কাছে যেতে চায়নি। কিন্তু ছেলে কোন কথা শোনেনি। অবশেষে সেই যাওয়াই বুঝি কাল হলো মার্থার।

সাজান ঘর তার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল।

রাতারাতি তারা পথের ফকির হয়ে গেল।

ছেলের আকস্মিক আত্মহত্যার সংবাদ পেয়ে মার্থা মেয়ে জুলিয়াকে নিয়ে যখন কলকাতায় ছুটে এলো তার একদিন আগেই দেহটা পর্যন্ত গোর দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড লুই, বিরাট এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসার অন্যতম পার্টনার চ্যাটার্জী বললে, "এতবড় বংশের ছেলে রবার্ট, তার মৃত্যুর পর তার হাতের লেখা চিঠি দেখেই যখন বুঝতে পারলাম সে আত্মহত্যা করেছে, কেলেঙ্কারি আর যাতে না ছড়ায় যথাসাধ্য চেষ্টা করে বহু টাকা ব্যয় করে, আত্মহত্যা ব্যাপারটা চাপা দিয়ে, স্বাভাবিক মৃত্যু বলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখিয়ে যত তাড়াতাড়ি পেরেছি মৃতদেহ কবর দিয়ে দিয়েছি।"

তবু মার্থা ভেবে পায় না, কেন তার ছেলে রবার্ট শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে গেল। ঐ দুর্ঘটনার দিন-দুই আগের লেখা চিঠিতেও রবার্ট তো তাকে এমন কিছু লেখেনি যা থেকে সে আত্মহত্যা করতে পারে এমন সন্দেহ মনে জাগতে পারে!

অথচ রবার্ট চিঠি লিখে রেখে গিয়েছে।

স্পষ্ট তারই হাতের লেখা: 'আমার স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়। ইতি রবার্ট লুই।'

মার্থা ভেবে পায় না।

কী এমন দুঃখ ছিল রবার্টের যে জন্য সে ঐ ভাবে আত্মহত্যা করল।

কিন্তু একমাত্র ছেলের মৃত্যুর আঘাতটাই সব নয়।

তার চাইতেও বড় এবং নির্মম আঘাত যে তাদের জন্যে হাঁ করে আছে সেদিন তা বুঝতে পারেনি মার্থা লুই। রবার্ট লুইয়ের আত্মহত্যার খবর পেয়ে তার কলকাতায় ফিরে আসবার পর পনেরটা দিনও গেল না, চ্যাটার্জীর সলিসিটারের কাছ থেকে এক চিঠি এলো মার্থার নামে।

চিঠিটা যেন নির্মেঘ আকাশ থেকে বজ্রপাতের মতই।

চ্যাটার্জী অ্যাণ্ড লুই কোম্পানির অন্যতম অংশীদারের ইচ্ছাক্রমে চ্যাটার্জীর আইন পরামর্শদাতা মৃত রবার্ট লুইয়ের মাতা মার্থা লুইকে জানাতে বাধ্য হচ্ছে যে, উপরিউক্ত কোম্পানির যাবতীয় শেয়ার ও দাবি এবং স্বত্ব মৃত রবার্ট লুই তার মৃত্যুর মাসখানেক পূর্বে ডি, এন, চ্যাটার্জীকে স্বেচ্ছায় বিক্রি করে দিয়েছে। এমন কি সেই সঙ্গে তার ঝাউতলার বসতবাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে। মৃত্যুর পূর্বে গত এক মাস মৃত রবার্ট লুই উক্ত কোম্পানিতে বেতনভুক্ কর্মচারী মাত্র ছিল এবং কথা ছিল ঝাউতলার বাড়িতে সে বাস করবে এবং ভাড়া বাবদ মাসে তিনশত করে টাকা দেবে। প্রতিশ্রুত দুই মাসের ভাড়ার দাবি জানিয়ে চ্যাটার্জীর আইন পরামর্শদাতা লিখেছেন, মার্থা লুই মাসে মাসে ঐ ভাড়া দিয়ে ইচ্ছা করলে ঝাউতলার বাড়িতে থাকতে পারেন। নচেৎ চিঠি পাওয়ার পর দশ দিনের মধ্যে তাকে সে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। যদি মার্থা লুই সে বাড়ি ছেড়ে দেন তাহলে গত দু মাসের ভাড়া মিঃ চ্যাটার্জী পূর্ব সম্পর্ক স্মরণ করে ক্ষমা করতে রাজী আছেন।

বজ্রাহতের মতই যেন মার্থা চিঠিটা হাতে করে চেয়ারে বসে থাকে।

চিরদিন তার ছেলে রবার্ট সমস্ত খরচপত্রের ব্যাপার দেখাশোনা করেছে। কোথায় কি টাকা আছে না আছে সে সম্পর্কে কিছুই জানে না মার্থা।

জুলিয়া সব শুনে বলে, "চল মামি, আমরা কোন উকিলের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিই। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র আছে। সব ঐ চ্যাটার্জীর শয়তানী।"

সেই দিন মা আর মেয়ে একজন বড় উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করল। কিন্তু উকিল বললে, "ঠিক আছে, আপনি মামলা দায়ের করুন তারপর দেখা যাবে।"

"কিন্তু এ যে মিথ্যা, এ যে হতেই পারে না।" মার্থা বলে।

"সবই বুঝতে পারছি মিসেস্ লুই, কিন্তু আইনের আশ্রয় আপনাকে নিতেই হবে। আইনই একমাত্র এর মীমাংসা করতে পারে। কিন্তু আমি বলি একবার আপনারা গিয়ে চ্যাটার্জীর সঙ্গে দেখা করুন। তবে আমার মনে হয় দেখা করেও হয়ত কোন ফল হবে না। কারণ আপনারা যা বলছেন তাই যদি সত্যি হয় ত সে আটঘাট বেঁধেই কাজে নেমেছে।"

"আমি বলছি উকিল সাহেব, সে যদি কোন কাগজপত্র তৈরি করেও থাকে, সব জাল, মিথ্যা।"

"কিন্তু সেটাও তো প্রমাণ সাপেক্ষ।"

তবু পরদিন সকালে মার্থা জুলিয়ার হাত ধরে থিয়েটার রোডে চ্যাটার্জীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

মার্থা সোজাসুজিই শুধায়, "আপনার এ চিঠির অর্থ কি মিঃ চ্যাটার্জী ?"

"চিঠির অর্থ তো চিঠিতেই পরিষ্কার আছে মিসেস্ লুই। সে তার সব শেয়ার আমাকে বিক্রি করে দিয়েছে।"

"কিন্তু কেন দেবে সে! তার বাবার ও আপনার বাবার দুজনের এতদিনকার তৈরী কারবার। তাছাড়া তার তো কোন রকম চরিত্রদোষ ছিল না, কোন রকম বদখেয়ালও ছিল না।"

"সে সব কথার আমি জবাব দেবো কি করে বলুন মিসেস্ লুই। যা সত্য তাই শুধু আপনাদের জানিয়েছি।"

"মিথ্যা, এসব মিথ্যা"—জুলিয়া হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে, "তুমি মিথ্যুক—"

"মেয়েটি তো অত্যন্ত ডেঁপো হয়েছে দেখছি আপনার মিসেস্ লুই। তা মিথ্যাই যদি মনে হয় তোমার তো আদালতেই সেটা প্রমাণ কর গিয়ে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই করবো। তুমি ভেবেছো তোমার এ শয়তানী আমরা সহ্য করে যাবো।"

"থাম্ ফচকে মেয়ে", দাবড়িয়ে ওঠে চ্যাটার্জী।

"কেন, থামবো কেন, তোমার ভয়ে ?" সমান তেজে জুলিয়া জবাব দেয়।

"আঃ জুলি, থাম থাম"—থামাবার চেষ্টা করে মার্থা মেয়েকে। তারপর চ্যাটার্জীর দিকে তাকিয়ে সানুনয়ে বলে, "ছেলেমানুষ, ওর কথা আপনি ধরবেন না মিঃ চ্যাটার্জী। আজ রবার্ট নেই, কিন্তু আমার আজকের এতবড় দুর্দিনে আপনিও যদি মিঃ চ্যাটার্জী, এই অনাথা দুটিকে রাস্তায় বের করে দেন তো আমরা কোথায় যাই। অন্ততঃ আমাদের যদি ঐ বাড়িতে থাকতে দেন আর সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে কিছু কিছু করে দেন—"

জুলিয়া আবার চেঁচিয়ে ওঠে, "কার কাছে তুমি দয়া ভিক্ষা করচো মামি। একটা সাক্ষাৎ শয়তান—"

"আঃ, জুলি!"—মার্থার বুঝি আর সহ্য হয় না। মার্থাকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে বোধহয় এগিয়ে এসেছিল জুলিয়া, মার্থা মেয়ের গালে সশব্দে ঠাস্ করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

হতভম্ব জুলিয়া একপাশে সরে দাঁড়ায়।

মার্থা আবার বলে, "দয়া করুন মিঃ চ্যাটার্জী!"

"শুনুন মিসেস্ লুই, দয়া আপনাকে আমি যথাসাধ্য করতে রাজী আছি, কিন্তু একটি শর্তে।" চ্যাটার্জী বলে।

"বলুন !"

"কোন রকম মামলা মকদ্দমার হাঙ্গামা করবেন না আপনি, স্ট্যাম্প কাগজে সই করে এখনই একটা বণ্ড দিতে হবে—"

"বণ্ড !"

"হ্যাঁ, তাতে যদি রাজী থাকেন তো ঝাউতলার বাড়িতেও গোটা দুই ঘর ছেড়ে দেবো আপনার থাকবার জন্যে আর মাসে একশ করে টাকা পাবেন। যদি রাজী থাকেন তো আমাকে জানালেই সব ব্যবস্থা করে দেবো।"

"মামি, এখনো তুমি ওই শয়তান কুকুরটার তোষামোদ করবে। অনুগ্রহ ভিক্ষা করবে। চল, চল—"

"অনুগ্রহের হয়েছে কি মিস্ লুই, এই তো সবে সন্ধ্যা—ও তেজ কোথায় থাকে দুদিনেই দেখবো।"

"চলে এসো মামি।"

মার্থাকে আর কোন কথা বলবার অবকাশমাত্রও না দিয়ে তার হাত ধরে টানতে টানতে চ্যাটার্জীর বাইরের ঘর থেকে বের হয়ে এসেছিল জুলিয়া।

তারপর দুদিন বাদেই মায়ের হাত ধরে জুলিয়া এসে চুঁচড়ায় তাদের পিতামহের এতকালকার অবহেলিত পরিত্যক্ত জীর্ণ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল।

এবং সে আশ্রয় নেওয়া মানে কোনমতে মাথা গুঁজে থাকা।

কিন্তু কেবল মাথা গুঁজলেই তো হবে না। দুটো প্রাণীর দুবেলা আহার আছে, গায়ে দেবার মত জামা-কাপড়েরও প্রয়োজন আছে।

বলতে গেলে কিছুই প্রায় আনেনি মার্থা তার ঝাউতলার বাড়ি থেকে চুঁচড়ায় সঙ্গে করে। জুলিয়া আনতে দেয়নি।

সামান্য কিছু জামা-কাপড়, বিছানা ও বাসনপত্র যা একান্ত প্রয়োজনীয় তাই সঙ্গে এনেছিল।

ঝাউতলার সাজান বাড়ি 'লাকি কটেজ' যেমনটি সাজান ছিল তেমনিই রেখে এসেছে মা আর মেয়ে। কেবল আসবার আগে ঘরে ঘরে তালা দিয়ে ও সদরে তালা দিয়ে রেখে এসেছে।

মার্থার অনুরোধে কর্ণপাত করেনি জুলিয়া, সে কিছুতেই চাবি চ্যাটার্জীকে দিয়ে আসতে পারেনি।

জুলিয়া কেঁদে বলেছিল, "না মামি, সে যদি জোর করে অধিকার করে তো করুক, আমি দেবো না নিজে হাতে—কিছুতেই না।"

কিন্তু হাতে তো বলতে গেলে মার্থার কিছুই ছিল না।

সামান্য যা ছিল গত দেড় মাসে তাও নিঃশেষিত। আজ দুদিন মা আর মেয়ের এক কাপ করে দুধহীন, চিনিহীন 'র' কফি খেয়েই কেটেছে।

জুলিয়া নিজের জন্যে ভাবে না কিন্তু মা এখানে আসা অবধি একপ্রকার শয্যাশায়ীই হয়ে পড়েছে বলতে গেলে। মাকে নিয়েই তার যত ভাবনা, চিন্তা।

মার্থা বলছিল, "জুলি, চ্যাটার্জী যা বলছিল তাই না হয়। এভাবে উপোস করে কেমন করে বাঁচবি ?"

"না। কিছুতেই তা আমি করতে দেবো না তোমাকে মামি।"

মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, কালো চাদরে ঢাকা এক দীর্ঘকায় মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। [পৃষ্ঠা ১৫২

"কি করবি বল, ভগবান যে মেরেছে রে আমাদের। নইলে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এতবড় সর্বনাশ হবে কেন ?"

সহসা ঐ সময় টুকটুক করে বন্ধ দরজায় মৃদু করাঘাত শোনা গেল।

"কে !" চমকে ওঠে জুলিয়া।

আবার টুকটুক শব্দ।

"এত রাত্রে কে দরজা নক করে"—মোমবাতিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল জুলিয়া।

মার্থা বাধা দেয়, "ওরে না না—এত রাত্রে দরজা খুলিস না জুলি।"

জুলিয়া কিন্তু কোন কথা শোনে না।

মোমবাতিটা হাতে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

কিন্তু দরজা খুলেই মোমবাতিটার আলোয় আগন্তুককে দেখে অর্ধস্ফুট চিৎকার করে ওঠে একটা। সমস্ত মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শুধু চোখ দুটি খোলা, সর্বাঙ্গ কালো

একটা চাদরে আবৃত দীর্ঘকায় এক মূর্তি। জুলিয়ার অর্ধস্ফুট চিৎকারশব্দ ঘরের মধ্যে মার্থার কানে গিয়েছিল। ঘরের ভিতর থেকে মার্থা চিৎকার করে শুধায়, "জুলি, জুলি—কি হলো ?"

কিন্তু জুলিয়ার কণ্ঠ দিয়ে স্বর বেরোয় না।

ভয়ে তখন সে ঠকঠক করে কাঁপছে কেবল।

হাতের মোমবাতিটা পড়ে গিয়ে নিবে গিয়েছে।

সব অন্ধকার। (ক্রমশঃ)

ভুট্টার দানা ফাটে কেন ?

উনুনের উপরে একটা কড়ায় কিছু বালি চাপান আছে। সেই গরম বালিতে ভুট্টার দানা ফট্ ফট্ আওয়াজ করে ফেটে বড় খই হয়ে সাদা ছোট ছোট ফুলের মত দেখাচ্ছে।

কেন গরমে পুড়ে ছাই না হয়ে ফট্ ফট্ করে ফেটে বড় হয়ে যায় একথা কি কেউ ভেবেছ কোন দিন ? কেন হয় বলতে পার কেউ ?

জলীয় গ্যাসই (steam) ভুট্টার দানাকে ফট্ করে ফাটিয়ে দেয়। কথাটা শুনলে ঠিক যেন পাগলের কথা বলে মনে হয়। গরম বালি আর শুকনো দানার ভেতর জলীয় বাষ্প আসবে কোত্থেকে ?

শুনে আশ্চর্য হয়ো না, প্রতি দানার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা থাকে। কিন্তু দানাটা ভাঙলে সে জলকণা চোখেও দেখা যায় না। যখন কড়ায় দানাটা বেশ গরম হয়ে ওঠে তখন তার ভেতরের জলকণা গরমে জলীয় গ্যাসে (steam) পরিণত হয়। তখনি ফট্ করে আওয়াজ হয়, আর ভেতরের জলীয় গ্যাস দানা ফাটিয়ে বেরিয়ে যায়। পড়ে থাকে ফুলের মত ফাটা খই। তখন সে বেশ ফুলে গেছে।

গঁদের আঠায় জোড়ে কেন ?

গঁদে বা আঠায় জোড়ে কেন এ কথা জানার আগে এই গঁদটা কি দিয়ে তৈরী জানা দরকার।

চুম্বক তোমরা সকলেই দেখেছ। চুম্বকের কাছে যদি একটা লোহার-জিনিস পড়ে থাকে সেটা চুম্বকে এঁটে যায়।

গঁদ হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলাদা পদার্থ। এই পদার্থগুলিকে বলে মলিকিউল (molecule)। সেই পদার্থগুলি নিজেরা চুম্বকের মত পরস্পরকে আকর্ষণ করে।

পৃথিবীতে যা কিছু দেখতে পাই সবই মলিকিউল (molecule) দিয়ে তৈরী। তবে সে সব জিনিসে মলিকিউলের ভাগের কম-বেশী আছে।

গঁদের মলিকিউল আবার কাগজের মলিকিউলকে টানে। এই ভাবে গঁদের আঠায় কাগজ, কাঠ ইত্যাদি জোড়া লাগে।

নানা রকমের গঁদ আছে ঃ কোন গঁদে কাঁচ জোড়ে, কোন গঁদে রবার জোড়ে। যেখানে দুটো জিনিস আঠায় জোড়া লাগে, জানবে গঁদের মলিকিউল তাদের টেনে রেখেছে।

'মারসী বকু'র দেশে

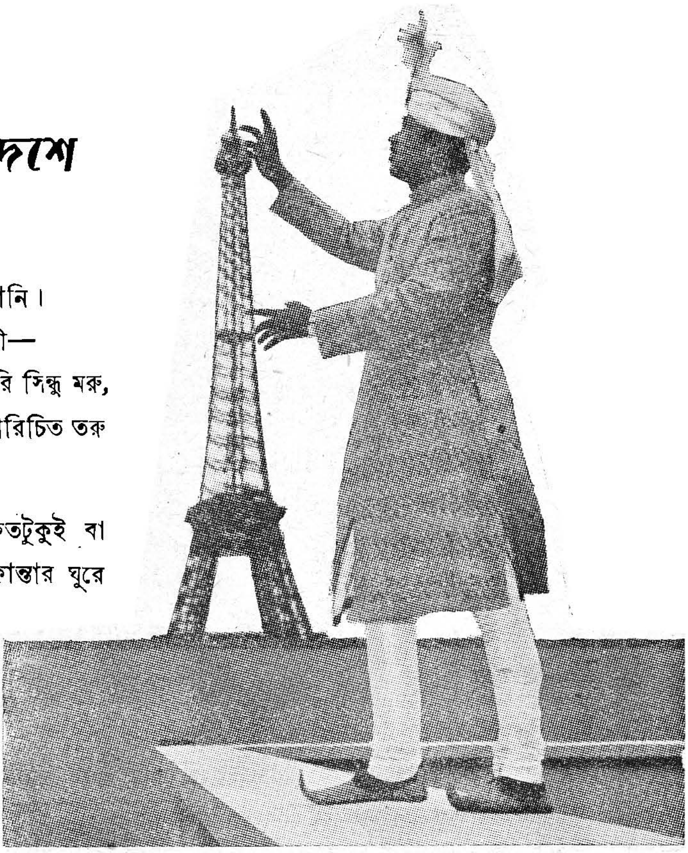

লিখেছেন ঃ
'জাদুসম্রাট' পি. সি. সরকার

কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

…"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু
র'য়ে গেল অগোচরে।…"

সত্যি এই বিপুলা পৃথিবীর কতটুকুই বা জেনেছি! যত দেশে নদ নদী মরু কান্তার ঘুরে দেখেছি তার কিছু কিছু এবারে নিয়মিত ভাবে কালির আখরে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করছি।

প্রথমেই আরম্ভ করি বিলাত দেশ দিয়ে—ধরা যাক 'প্যারিস' শহরের কথা।

আমি গত দশ বছরে অন্ততঃ বিশবার এই প্যারিস শহরে এসেছি। লণ্ডন এবং প্যারিসের রাস্তাঘাট দোকানপাট বাড়িঘর যত চিনি সত্যি কথা বলতে কি আমাদের কলিকাতা শহরেরও অলিগলি আমি তত চিনি না।

বিদেশ ভ্রমণ আমার নেশা এবং পেশায় পরিণত হয়েছে—তাই সারা পৃথিবীর সমস্ত বড় বড় রাজধানী ও শহরে আমাকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হয়। কোনো দেশে ঘুরে বেড়াতে হলে সে দেশের ভাষা জানা চাই। তাই সেইসব দেশের ভাষা শিখে, সে দেশের চালচলন আচার-ব্যবহার আদবকায়দা জেনে আমায় সেই দেশের থিয়েটারে দল-বল নিয়ে ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করতে হয়। তাদের দেশের লোকেরা কি ভালবাসে, কোন্ ব্যাপারে তারা হাসির খোরাক পায়, কোন্ বিষয় তারা পছন্দ করে না—সব খুঁটিনাটি জিনিস মনোবিজ্ঞানীর ন্যায় খুঁজে বের করে শিখে নিতে হয়। তাই আমি সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকের অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়ে থাকি।

ইংরেজিতে একটা চমৎকার গান আছে—"Paris in Spring" অর্থাৎ "বসন্তকালের প্যারিস"। প্যারিস শহর এমনিতেই অতি সুন্দর, এর সুন্দর সাজানো বাগান শীতের অবসানে

আবার ফলে-ফুলে সুষমামণ্ডিত হয়ে ওঠে—তাই লোকেরা প্যারিসে বসন্তের জয়গান গেয়েছেন। আমি গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত, বসন্ত সব ঋতুতেই প্যারিসে এসেছি—আমার কাছে চিরটা কালই প্যারিস ভাল লেগেছে।

বসন্তকালে এর ফুলের বাগান যেমন সৌন্দর্যে ভরপুর মনে হয়—শীতকালে বরফে আবৃত হলেও তার অন্যরকম সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মকালে লোকেরা সবাই ঝলমলে বাহারী পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে আরও সুন্দরতর করে তোলে প্যারিসকে। বর্ষাকাল বলে প্যারিসে কোনও আলাদা ঋতু নেই, সব সময়েই ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টি নামে—সে গ্রীষ্মই হউক আর শীতই হউক। আসলে এখানে দুটি ঋতুই প্রধান—গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল। এই দুইএর মাঝখানে একদিকে রয়েছে মধুর বসন্তকাল আর অপরদিকে শরৎকাল। বসন্ত-সমাগমে গাছে নূতন পত্রপল্লব অঙ্কুরিত হয়ে শোভাবর্ধন করে আর শরৎকালে শিশির পড়ার সাথে সাথে গাছের পাতা ঝরে পড়া শুরু হয়ে যায় আর শেষ পাতাটি ঝরে পড়ে শীতের সমাগমে।

গ্রীষ্মকালে প্যারিসের লোকেরা নানা রংবেরঙের নাইলন, শিফন, ডেক্রণ প্রভৃতির পোশাক পরে, আর শীতকালে নানারকম চামড়ার কোট, ফার কোট, গরম উলের জামা, সুয়েটার পুলোভার আর নানা ডিজাইনের ওভারকোট পরে থাকে।

প্যারিস তার ডিজাইন এবং স্টাইলের জন্য জগৎপ্রসিদ্ধ। এমন কি আমেরিকাও প্যারিসের ফ্যাসান আর স্টাইল অনুকরণ করে চলে।

প্যারিস হচ্ছে যেন আর্টিস্টের দেশ, এরা সব কিছুই আর্টিস্টের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করে থাকে। তাইত প্যারিস আজ হয়েছে পৃথিবীর সব চাইতে সুন্দর শহর। এর বাড়িঘর সব ছবির মত সুন্দর।

নিউইয়র্কে যে ঐশ্বর্যের বাড়াবাড়ি দেখেছি প্যারিসে তা' নেই। যন্ত্রজগতের চরম বিস্ময়ের বস্তু নিউইয়র্ক শহর আমার কাছে বিরাট দৈত্যের মত মনে হত। সেখানে লোকেরা হেঁটে পথ চলে না—দৌড়ায়। তাদের যেন সময় নেই—প্রতিটি সেকেণ্ড হিসাব করে চলে। ফুস্ করে লিফ্‌টে চড়ে একশ' তলা উঠে যাচ্ছে—অটোমেটিক মেসিনে সব কাজ করে নিচ্ছে। সর্বদাই একটা বিস্ময় আতঙ্কে দিন কাটে।

প্যারিস শহর সম্পূর্ণ বিভিন্ন, আধুনিক যন্ত্রজগতের সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিস্ময়কর সমাবেশ প্যারিস শহরটাকে মনোমুগ্ধকর করে রেখেছে। বিরাট ১৫০ ফুট চওড়া কংক্রীটের রাস্তায় পাশ দিয়ে চলেছে সবুজ গাছের সারি আর দুই দিকে বাহারী ফুলের বাগান।

দোকানপাট সুন্দর রঙে সাজানো, শোকেসগুলি বেশ পারিপাট্যময় এবং ফরাসীদেশীয় লোকজনের সারি চলেছে পাশ দিয়ে—বৈচিত্র্যময় তাদের পোশাক। ফরাসীদেশের লোকেরা তাঁদের এই রাজধানী শহরের জন্য গর্ব অনুভব করেন। গর্ব এঁদের খুবই সাজে। প্যারিস হচ্ছে সৌন্দর্যের লীলানিকেতন।

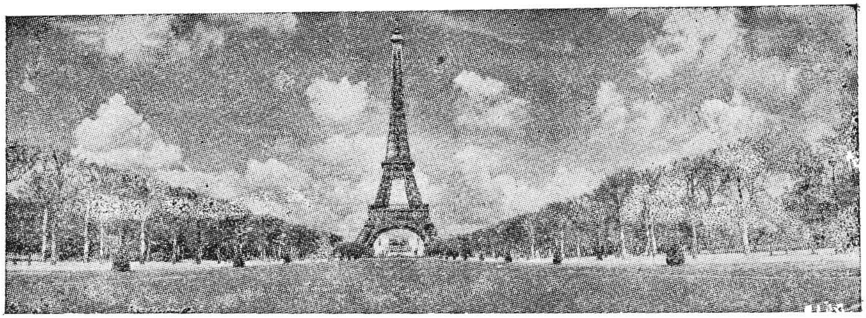

দিনের আলোয় এফিল টাউয়ার

একমাত্র জাপানে এরূপ সৌন্দর্য দেখেছি, কিন্তু জাপানও শুধু সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে—যন্ত্রযুগের অতি আধুনিক সাজসরঞ্জামের দিকে ততটা দৃষ্টি দেয়নি। প্যারিসে পাওয়া যায় উভয়ের অদ্ভুত বিস্ময়কর মিশ্রণ।

প্যারিসের "এফিল টাউয়ার" (Eiffel Tower) পৃথিবীবিখ্যাত। সমস্তটা স্তম্ভ ইস্পাতে তৈরী যার ওজন সাত হাজার টন, এর প্রকৃত উচ্চতা এক হাজার পঞ্চাশ ফুট এবং এটি এফেল নামক একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার তিন বৎসরের মধ্যেই (১৮৮৭—৮৯) সমাধা করেন। আমি এই এফিল টাউয়ারের চূড়ায় উঠে তেনজিংএর এভারেস্ট-বিজয়ের গর্ব অনুভব করেছি। উপর থেকে মনে হয় যেন শূন্যে আকাশপথ থেকে নীচে জনগণকে দেখছি।

আমেরিকার 'এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং' যদিও এফিল টাউয়ারের চাইতেও উঁচু, কিন্তু সেখান থেকে নীচে তাকালে সব সময় নীচের রাস্তাঘাট লোকজন স্পষ্ট দেখা যায় না—মাঝপথে মেঘ প্রায়ই বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু 'এফেল টাউয়ার' অসম্ভব উঁচু নয়—আবার নীচুও নয়। তাই প্রতিদিনই পনের হাজার জন 'টুরিস্ট' গড়পড়তায় এই এফিল টাউয়ার দেখতে আসেন। লিফ্‌টে চড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ওঠা চলে—মাঝপথে একটি প্রথমশ্রেণীর 'রেস্টুরেণ্ট' আছে, সেখানে খাওয়াদাওয়া সেরে নিলে মনের আনন্দে সময় কাটানো সম্ভবপর।

প্যারিসে রেস্টুরেণ্টের অভাব নেই, পথের মোড়ে মোড়ে শত শত 'রেস্টুরেণ্ট' আর 'কফি হাউস'। শত শত বললে ভুল হবে কারণ প্যারিস শহরে মোট আট হাজারের বেশী এই রেস্টরেণ্ট রয়েছে—সরাইখানা বা হোটেল বাদেই এই হিসাব ধরা হয়েছে।

এত হাজার রেস্টুরেণ্ট আর কফি হাউস রয়েছে বলেই খাবার খুব সস্তা মনে করলে ভুল হবে। এক কাপ কফি বা চায়ের দাম পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক অর্থাৎ আট আনা। কিন্তু এ শুধু কাল কফির দাম এবং দোকানের কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে খেতে হবে, আর এই কফি দেওয়ার জন্য দোকানীকে কমপক্ষে পাঁচ ফ্রাঙ্ক বকশিস (টিপ্) দিতে হবে। কফির সঙ্গে দুধ নিলে দাম আরও বেশী, আর চেয়ারে বসে খেলে দাম আরও বেশী, টিপ্‌সের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে বেশী।

প্যারিসের কথা বললে এই 'টিপ্‌স' বা বকশিসের কথাও বলতে হবে। একটা নৃত্যনাট্য বা থিয়েটার দেখতে যাবেন—প্রথমে টিকিটটা কিনলেন। হোটেল থেকে ট্যাক্সি ডেকে বললেন, "ক্যাসিনো ডি প্যারী" থিয়েটারে নিয়ে চল। ট্যাক্সি-ড্রাইভার সানন্দে আপনাকে গাড়িতে বসিয়ে মিটার ডাউন করে দিল। মনে করুন মিটারে চল্লিশ ফ্রাঙ্ক উঠেছে, আপনাকে ভাড়া দেবার সময় ৪০ ফ্রাঙ্ক ভাড়া+১০ ফ্রাঙ্ক টিপ্ মোট ৫০ পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক দিতে হবে।

আপনি থিয়েটারে ঢুকলেন। প্রথমে ওভারকোটটা ওদের ক্লোকরুমে জমা রেখে গেলেন,—সেখানে ৫০ ফ্রাঙ্ক ভাড়া+৫০ ফ্রাঙ্ক টিপ্ দিতে হবে। হলে ঢুকবার আগে 'টয়লেটে' গেলেন, সেখানেও ১০ ফ্রাঙ্ক চার্জ আর ১০ ফ্রাঙ্ক টিপ্ দিয়ে এলেন। তারপর টিকিট নিয়ে হলে প্রবেশ করলেন,—হলের লোকেরা আপনার টিকিটের অর্ধেকটা ছিঁড়ে নিলো আর আপনার সিটটা দেখিয়ে দিলো। সে দাঁড়িয়েই রয়েছে, আপনি তাকে অন্ততঃ ৫০ ফ্রাঙ্ক থেকে ১০০ ফ্রাঙ্ক টিপ্‌স দেবেন তবে সে নড়বে। নইলে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবে "টিপস্ প্লিজ্" "সারভিস্ প্লিজ্"। 'শো' আরম্ভ হবে, একটা প্রোগ্রাম কিনে নিন,—প্রোগ্রাম-বিক্রেতা সানন্দে আপনাকে একটি প্রোগ্রাম হাতে তুলে দেবে। দাম মনে করুন ১০০ ফ্রাঙ্ক কিন্তু আপনাকে দিতে হবে (১০০+২৫) মোট ১২৫ ফ্রাঙ্ক কারণ অন্ততঃ ২৫ ফ্রাঙ্ক সে টিপ্‌স আশা করে। আমার এক বন্ধু ইনটারভ্যালের সময় একটু তৃষ্ণা বোধ করাতে এক গ্লাস সরবৎ (কোকাকোলা) খেলেন। বাইরে দাম ৫০ ফ্রাঙ্ক, তিনি হলে কিনলেন ১০০ ফ্রাঙ্ক দিয়ে+টিপ্‌স আরও ২৫ ফ্রাঙ্ক।

প্যারিসে কথায় কথায় এই টিপ্‌স, বকশিস আর সারভিস।

বিশ্বাস করবেন না, একবার আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে পোস্টাফিসটা কোন্ দিকে দেখাবেন কি? তিনি কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আমাকে ডাকঘরের সাইনবোর্ডটা দেখিয়ে দিলেন—আমি খুশী হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি তখন তিনি সামনে সারি দিয়ে বললেন—"সারভিস"। অগত্যা পকেটে হাত দিয়ে ৫০ ফ্রাঙ্কের একটা মুদ্রা তার হাতে গুঁজে দিলাম আর মনে মনে বললাম—হায়রে প্যারিস—ধন্য তোমার টিপ্‌স বা সারভিস প্রথা !!!

লোকজনকে কথায় কথায় টিপ্‌স বা বকশিস দেওয়া ইউরোপের একটা প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংলণ্ডেও এই সারভিস্ টিপ্‌স দেওয়ার পদ্ধতি আছে সত্য কিন্তু প্যারিসের কাছে কেউ নয়!

প্যারিসে হিসাব করে দেখা গিয়েছে মোট তিনশত পঞ্চাশ (৩৫০) সিনেমা, দুইশত ক্যাবারে ডান্স হল এবং অনেকগুলি মিউজিক হল এবং সার্কাস আছে। এখানে চারদিকে দেওয়ালে ঘেরা উপরে ছাদে ঢাকা সার্কাসঘর আছে—তাঁবুর নীচে বসে শীতে কেঁপে জলে ভিজে সার্কাস দেখতে হয় না।

থিয়েটারে প্রথমশ্রেণীর নাট্যসমূহ নিয়মিত প্রদর্শিত হয়—ফরাসী ভাষা জানা না থাকলে বুঝতে

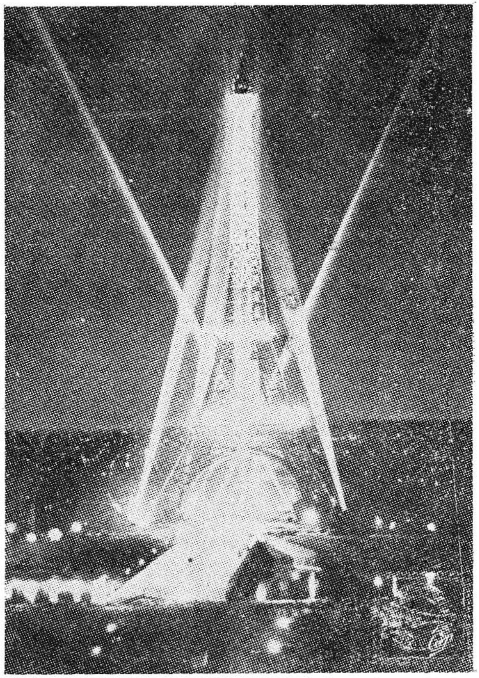

রাতের আলোয় টাউয়ার এফিল। দিনের আলোয় এফিল টাউয়ার চড়ে দেখে গর্ব হয়—আর রাতের অন্ধকারে এফিলের আলোক-সজ্জা দেখে মুগ্ধ হতে হয়।

কষ্ট হবে,—কিন্তু মিউজিক হলে (যেমন Folies Bergere, Casino de Paris প্রভৃতিতে) অতি উচ্চশ্রেণীর 'স্টেজ শো' দেখানো হয়।

নাইটক্লাবেও নানারকম নাচ-গান-হল্লার ব্যবস্থা আছে, তার মধ্যে কয়েকটি নাইটক্লাব (যেমন Lido, Moulin Rouge প্রভৃতি) জগৎপ্রসিদ্ধ।

এখানেও প্রথমশ্রেণীর 'স্টেজ শো' দেখানো হয়। থিয়েটারের মধ্যে কয়েকটি (যেমন T. N. P. বা Theatre National Populaire, Chatlet, Comedie-Francaise এবং বিশেষ করে Opera House) খুবই সুনাম অর্জন করেছে। আমার মনে হয় যে প্যারিসের অপেরা হাউসই বর্তমান পৃথিবীর সর্ববৃহৎ থিয়েটার কারণ এই অপেরা হাউসটি ১২৩,০০০ বর্গফুট জায়গা অধিকার করে দাঁড়িয়ে আছে।

এই অপেরা হাউসের সম্মুখের অংশে কলিকাতা চৌরঙ্গীর মত প্যারিসের প্লেস ডি লা অপেরা (Place de l' Opera) এবং এখানে গাড়ি ঘোড়া যাত্রীর অসম্ভব ভিড় হয়। এখানেই আমি ১৯৫০ সালে চক্ষুর উপর পুরু ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় বহু মাইল পর্যন্ত সাইকেল চালিয়েছিলাম—সেই সংবাদ রয়টার এবং বৃটিশ ইউনাইটেড প্রেস কর্তৃক পৃথিবীর সকল দেশেই প্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য পৃথিবীতে এর চাইতেও ভিড়ের জায়গা আছে যেমন নিউইয়র্ক শহরের টাইমস্ স্কোয়ার। আমি সেখানেও ১৯৫৭ সালে (২২শে মে, ১৯৫৭) চক্ষুর উপর ব্যাণ্ডজ বেঁধে সাইকেল চালিয়েছিলাম। নিউইয়র্কের এন. বি. সি. টেলিভিশন আমার সেই ক্রিয়াটি সমস্ত আমেরিকার টেলিভিশনের সংবাদ-বিচিত্রা হিসাবে প্রদর্শন করেছিল। ঐটির জন্য আমার X-Ray Eyes খেলাটি এত প্রসিদ্ধি পেয়েছে।

প্যারিসে বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানসমূহের মধ্যে এই অপেরা হাউস, এফিল টাউয়ার, আর্ক

ডি ট্রিয়ম্প, সাঁসে লিঁজে, নোতর ডাম গির্জা প্রভৃতি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা শ্যামবাজারে যেমন পাঁচমাথার মোড় খুব বিখ্যাত এবং সেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রতিমূর্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে প্যারিসেও তেমনি একস্থানে বারোটি রাস্তা মিলিত হয়ে একটা স্টার বা তারকা সৃষ্টি করেছে। ফরাসী ভাষায় স্টার কথাটিকে বলা হয় Etoile কাজেই এই স্থানের নাম Place de l' Etoile. এখানে একটি প্রকাণ্ড তোরণ তৈরী হয়েছে যার নাম (Arc de Triomphe) 'আর্ক ডি ট্রিয়ম্প'। সম্রাট্ নেপোলিয়নের সময় এটি নির্মিত হয় এবং এটি ফরাসী দেশের জাতীয় গৌরবের স্মারকচিহ্ন।

বিগত প্রথম মহাযুদ্ধে মৃত সৈন্যদের আত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এখানে সর্বদা একটি আলোকবর্তিকা জ্বলে থাকে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে আলো জ্বালান হয় এবং সে বর্তিকা অবিরাম জ্বলতেই থাকে।

এই বারোরাস্তার সন্ধিস্থলে, আর্ক ডি ট্রিয়ম্পের কাছেই এদের প্রসিদ্ধ Etiole Theatre. আমরা ১৯৫৫ সালে এই থিয়েটারেই এক সপ্তাহের জন্য ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করতে গিয়ে মোট আট সপ্তাহ ঐ একই রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করে নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম।

প্যারিসের নোতর ডাম গির্জা জগৎপ্রসিদ্ধ। ১১৬৩ সালে এইটি প্রস্তুত হয় এবং এই গির্জাকে কেন্দ্র করেই প্যারিস শহর সৃষ্ট হয়। মধ্যযুগে এই নোতর ডাম গির্জার সম্মুখের আঙ্গিনায় মেলা বসতো, প্রদর্শনী হতো সেখানে সর্বশ্রেণীর লোকেরা মিলিত হতেন, জাদুকরেরা তাঁবু খাটিয়ে সেখানে খেলা দেখাতো, বণিকরা নানারকম ব্যবসা করতেন, ভিক্ষুকরা সেখানে ভিক্ষায় বেরুতো। বিখ্যাত সাহিত্যিক ভিক্টর হিউগো (Victor Hugo) তাঁর জগৎপ্রসিদ্ধ পুস্তক The Hunchback of Notre Dameএ বিশেষভাবে সেকালের এই গির্জার কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সম্রাট নেপোলিয়নের রাজ্যাভিষেক ঐ গির্জাতেই সুসম্পন্ন হয়েছিল।

সাঁসে লিঁজে (Champs Elysees) হচ্ছে প্যারিসের একটি অতি প্রসিদ্ধ রাজপথ—এবং সৌন্দর্যের জন্য এর জগৎজোড়া সুনাম। আমাদের দেশের রাজধানী যেমন পুরানো দিল্লী আর নয়া দিল্লী দু'ভাগ করা আছে, প্যারিস শহরেও পুরানো অংশ আধুনিক অংশ আছে এবং তার যোগাযোগ ঘটিয়েছে সোয়া মাইল দীর্ঘ এই প্রসিদ্ধ রাজপথ সাঁসে লিঁজে। দুই দিকে সুন্দর বৃক্ষসারি দিয়ে সাজানো—এই রাজপথের যেন তুলনা হয় না।

প্যারিসের রাস্তায় বের হলেই প্রত্যেক বড় বড় রাস্তার মোড়ে সাইনবোর্ড দেখা যায়—"মেট্রো" (METRO). অনেকে হয়ত মনে মনে ভাববেন যে মেট্রো কোম্পানি কত সিনেমা তৈরি করেছে এই প্যারিস শহরে। আসলে কিন্তু প্যারিসের মাটির নীচের রেল লাইনের নাম মেট্রো (Metro) এবং প্রত্যেকটি স্টেশনে ঐরূপ বড় বড় সাইনবোর্ডে লেখা আছে METRO. অনেকের ধারণা

নেপোলিয়নের সময়ে তৈরী তোরণ
আর্ক ডি ট্রিয়ম্প

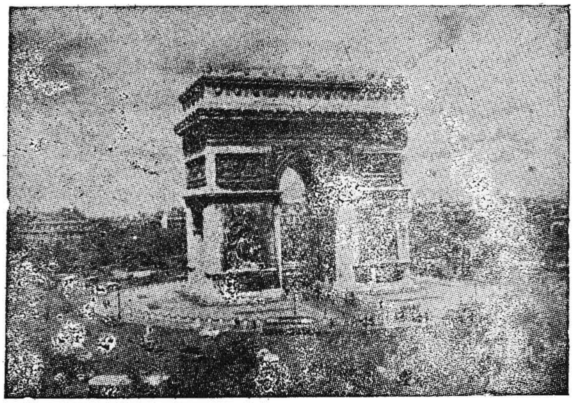

শুধু লণ্ডনেই মাটির তলায় ট্রেন আছে, কিন্তু তা নয়, শুধু আমাদের এই কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী বাদে সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রত্যেক বড় বড় শহরেই মাটির নীচে রেলপথ আছে।

প্যারিসে মাটির নীচের ট্রেনের প্রায় বারোটা বিভিন্ন লাইন আছে এবং মোট চারিশতের মত বিভিন্ন স্টেশন আছে এবং এই চারিশত জায়গায় মেট্রো (Metro) সাইনবোর্ড দেওয়া আছে।

মাটির নীচের ট্রেনে দু'টি ক্লাস রয়েছে—প্রথম এবং দ্বিতীয়, ঠিক কলিকাতার ট্রাম কোম্পানির মত। প্রথম শ্রেণীর ভাড়া অপেক্ষাকৃত বেশী। একবার টিকিট কিনলেই এক স্টেশন থেকে অন্য যে কোন স্টেশনে যাওয়া চলে, তবে একবার বাইরে এলে আবার টিকিট কিনে ঢুকতে হবে,—ঠিক ওদেশের continuous সিনেমার মত। বেলা দশটার সময় টিকিট কিনে ঢুকলে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বসে ঐ একই টিকিটে সিনেমা দেখা চলে কিন্তু একবার বেরিয়ে এলেই আবার টিকিট কিনে ঢুকতে হবে।

ফরাসীদেশ মদের জন্য এবং সেণ্ট বা সুগন্ধ নির্যাসের জন্য পৃথিবীবিখ্যাত। এদেশের গরীব মেয়েরাও দামী সেণ্ট দু' চার ফোঁটা ব্যবহার করে। পুরুষেরা খেতে বসলে জল খায় না, সবাই মদ খায়। এদেশে প্রচুর আঙ্গুর জন্মে, কাজেই মদও সস্তা। নেশা করার মত মদ নয়—আহারের সঙ্গে পানীয় হিসেবে এরা সবাই ব্যাপকভাবে মদ খায়। আমরা খেতে বসে মদ না খেয়ে সবাই জল খাই দেখে এরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

ফরাসীদেশের মেয়েরাও খুব পরিশ্রমী। অফিসে পুরুষের মত তারা সমান পরিশ্রম করে থাকে।

প্যারিস আরামের দেশ, স্টাইলের দেশ, সবাই বিশেষ করে মেয়েরা বাবুগিরি করে দিন কাটায় এ ধারণা করলে ভুল হবে।

কাজের সময় এরা খুবই কাজের। আবার অবসর পেলেই নানারকম আধুনিক সাজসজ্জা করে এরা বেরিয়ে পড়ে।

ফরাসীদেশের সাম্প্রতিক এক পরিসংখ্যানে প্রকাশ যে সে দেশে মেয়েদের মধ্যে দুই হাজার চারিশত জন ডাক্তার, চারি হাজার জন কম্পাউণ্ডার, বারো জন সার্জন, এক হাজার একশত সত্তর জন আইনজীবী, তিনশত জন পুলিস, আঠারো জন রেল-ইঞ্জিনচালক, চারিশত জন ট্যাক্সী-ড্রাইভার, সাত জন এয়ারপোর্ট কনট্রোলার, তিনশত কুড়ি জন মাল এবং ময়লা-টানা লরীর ড্রাইভার।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ফরাসীদেশের মেয়েরাও তাদের পুরুষদের সাথে একযোগে জীবিকা অর্জনের লড়াইতে যোগ দিয়েছে। চাকুরিতে রুচি এবং মর্যাদার দিকে না তাকিয়ে তারা ময়লা-টানা গাড়ির ড্রাইভার হতেও কুণ্ঠিত হয়নি। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এটা বিখ্যাত ডাক্তার কুরী এবং তাঁর সহধর্মিণী বিদুষী ম্যাডাম কুরীর দেশ—যেখানে স্বামী স্ত্রী—পুরুষ রমণী—দু'জনেই নোবেল প্রাইজ পেয়ে জগতে নূতন রেকর্ড স্থাপন করে গিয়েছেন।

পদার্থবিদ্যায় এদেশে ম্যাডাম কুরী এবং ডাক্তার কুরী জগৎপ্রসিদ্ধ হয়েছেন। রেডিয়াম আবিষ্কার এবং অণু-পরমাণুকে (cyclotron) মেসিন দিয়ে বিভক্ত করা ওদেশে প্রথম প্রমাণিত হয়েছিল। গ্যাসভরতি বেলুন প্রথমে ওরাই উড়িয়েছিল। ওদের লুই পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসার সন্ধান দিয়েছেন। বহু বড় বড় গণিতজ্ঞ এবং রসায়নবিদ্ ফরাসীদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছেন। ভাস্কর্যে এবং চিত্রবিদ্যায় ওরা জগতের সেরা বলে স্বীকৃত হয়েছে। অতি আধুনিক চিত্রবিদ্যায় পিকাসোর নাম আমরা সবাই জানি। সাহিত্যিকদের মধ্যে এমিল জোলা, মোঁপাসা, বালজাক, ভিক্টর হিউগো প্রভৃতির নাম অমর হয়ে রয়েছে।

এদেশের জাদুকর রবার্ট হুডিন (Robert Houdin) বর্তমান পৃথিবীর স্টেজ ম্যাজিকের জনক বলে স্বীকৃত। এই হুডিনের নামকে নকল করে একজন আমেরিকান জাদুকর তাঁর নিজের নাম এরিখ ওয়াইস (Erich Weiss)-এর পরিবর্তে হুডিনেরই মত (like Houdin) জানাবার উদ্দেশ্যে একটি ইংরাজী 'I' অক্ষর জুড়ে দিয়ে নিজের নাম "হুডিনি" (HOUDINI) করে নিয়েছিলেন। উত্তরকালে এই 'হুডিনি' অবশ্য 'হুডিন' অপেক্ষাও অধিকতর সুনাম অর্জন করেন।

ইংরেজরা রবার্ট হুডিন বলে উচ্চারণ করলেও আসলে ফরাসী উচ্চারণে তাঁর আসল নাম ছিল "রোবেয়ার উঁদা" এবং ফরাসীদেশে তিনি উঁদা নামেই পরিচিত, 'হুডিন' বললে কেউ চিনবেনই না। তাঁর সমাধি রয়েছে ব্লোয়াঁ (Blois) শহরে। আমাদের ফরাসী ভাষা উচ্চারণ করতে একটু কষ্ট হবে বইকি! ফরাসী ভাষায় শেষের S অক্ষরের উচ্চারণ নেই। ইংরেজী A অক্ষরে 'আ' হয়। কাজেই PARIS বললে প্যারিস হয় না, "পারী" হবে। ওরা কখনও ওদের শহরকে প্যারিস বলে না, ওটা ওদের 'পারী' শহর।

ইংরেজী-জানা লোকদের ফরাসী ভাষা উচ্চারণ খুব কঠিন হয়ে ওঠে। আমরা যে

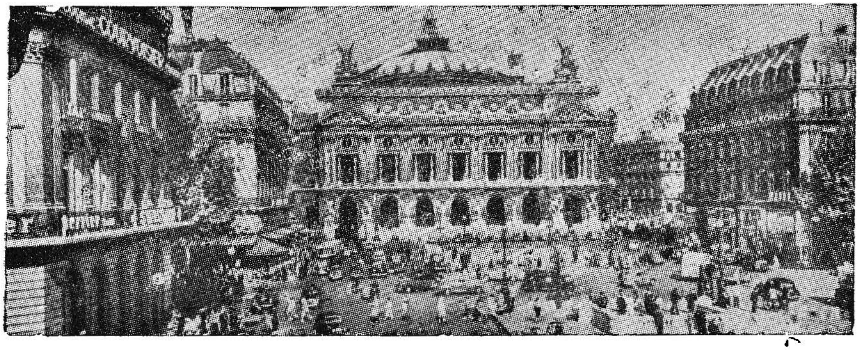

—প্লেস ডি লা অপেরা— প্যারিসের জনবহুল স্থান

থিয়েটার হলে জাদুবিদ্যা প্রদর্শন করেছিলাম তার নাম থিয়েটার ইতোয়াল (Etoile)। পূর্বেই বলেছি ফরাসী ভাষায় ইতোয়াল বলে নক্ষত্রকে। আমরা আমাদের ইংরেজ ও ভারতীয় বন্ধুদের এই থিয়েটারের নাম ইতোলী বা ইটোইলি বলতে শুনতাম আর মনে মনে হাসতাম। ওটা ইতোয়াল (Etoile) হবে, যেমন Blois ব্লয়স্ নয় ব্লোয়াঁ হবে। এভিনিউ Champs Elysees সবাই 'চাম্পস্ ইলিসিস্' পড়বেন কিন্তু আসলে ওটা 'সাঁসে লিঁজে'।

এদেশে আসতে হলে কিছুটা ফরাসী ভাষা শিখে আসলে ভাল হয়। মারসী বকু কথাটা খুবই ব্যবহার হয়। 'মারসী' (merci) অর্থ 'ধন্যবাদ' আর 'বকু' (beaucoup) অর্থ 'অনেক'। ইংলণ্ডে যেমন কথায় কথায় Thank you, Excuse me বলতে হয় এখানেও তেমনি 'মারসী বকু' কথাটার খুবই প্রচলন। ওদের দেশের এক দুই তিন বলতে 1, 2, 3, 4 লেখা হলেও আঁ, দো, ত্রোয়া, কাট্র, সাঙ্ক, ছিছ, সেট্, হুইট, নিউফ্, ডিছ পড়তে হয়।

নেপোলিয়নের দেশ, জোন অব আর্কএর দেশ এই ফ্রান্স আমার খুব ভাল লেগেছে। এদের অন্যান্য অনেক শহরেই গিয়েছি—অনেক ছোটখাটো শহরে খেলা করে বেড়িয়েছি কিন্তু "পারী"র তুলনা হয় না। এই প্রবন্ধটা আজ ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ মঙ্গলবার পারীতে বসে বসেই লিখলাম। এখন যে এখানে Paris in Spring শুরু হয়েছে। "মারসী বকু", "মারসী বকু"—

একটুখানি হাসো

কমল—পরীক্ষ-ফলের রিপোর্ট দেখে কেউ ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে বলে জান কি ?

বিমল—জানি, আমার মা পারে। এবার আমার রিপোর্ট দেখে ঠিকই বলেছিল, রাত্তিরে বাবা এসে কি করবে ?

মীরা গোস্বামী স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতায়
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

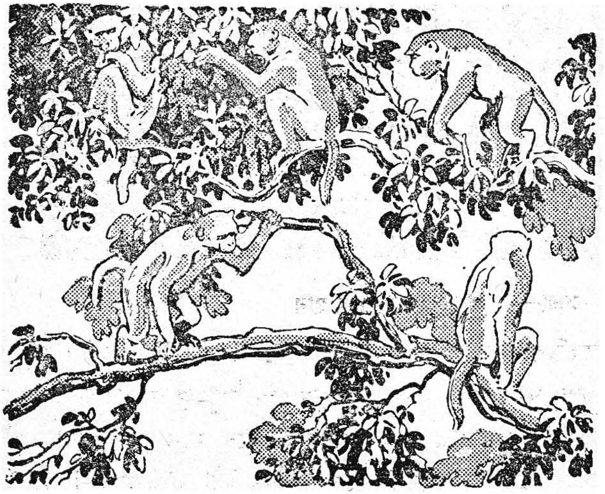

মেনি

●

সুশীল সিংহ

ছোট থেকেই আমার বানর পোষার শখ। কতবার বানর-পালের সঙ্গে এধার-ওধার ছুটে বেড়িয়েছি কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা বাচ্চা ধরতে পারিনি। হঠাৎ সেদিন পড়তে বসেছি, জানলার বাইরে ভলুকাকু উঁকি মেরে ফিসফিসিয়ে বললেন—ধীরু, বাঁদরছানা নিবি তো আয়।

তাড়াতাড়ি বইগুলো গুটিয়ে আস্তে আস্তে পা টিপে টিপে খিড়কিদরজা দিয়ে চম্পট দিলাম ভলুকাকুর সঙ্গে। বড়পুকুরের পাড়ে তখন হৈ-হৈ কাণ্ড। গাছের তলায় মণ্টু, ঝণ্টু, হাবুল, নীলু সব ভিড় জমিয়েছে, ওপর দিকে তাকিয়ে হাত চাপড়ে কত কি বুলি আওড়াচ্ছে আর তাই দেখে দেখে বানরগুলো গাছটার এ ডালে ও ডালে 'ওঁক-আঁক' করে লাফালাফি করছে। কাছে এসে দেখলাম কালু আর বাবলু একধারে দু-দুটো বানরবাচ্চাকে ধরে আছে শক্ত করে। আমাকে দেখেই কালু তার হাতের বাচ্চাটাকে তুলে ধরে বলল—তুই এইটা নিবি ধীরু? দেখছিস না কেমন তেজী!

তাই ঠিক হল। বারকতক বাচ্চাটার গায়ে হাত বুলিয়ে বললাম—আমি এটাই নেবো ভলুকাকু।

কালুর হাত থেকে বাচ্চাটাকে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বাড়ি চলে আসি।

ঘরে ঢুকতেই দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন আমার জন্য। আমায় দেখে বড় বড় চোখে ধমকে উঠলেন—পড়তে বসে ওই করা হচ্ছিল? যা—ছেড়ে দিয়ে আয় এক্ষুনি, যা বলছি।

শুকনা কাঠের মত দাঁড়িয়ে রইলাম বাচ্চাটাকে ধরে। ছেড়ে দিতে হবে ভেবে মনটা কেমন যেন করে উঠল। বাইরে যাব বলে সবে এক পা বাড়িয়েছি এমন সময় দিদিমা ঘরে ঢুকলেন। আমার মুখ দেখে মনের কথা বুঝতে পেরে বাবাকে বললেন—ছেলেটার যখন শখ হয়েছে—পুষলই বা। বাবা দিদিমার কথা আর এড়াতে পারলেন না। মুখে কিছু না বললেও বাধা দিলেন না।

চাকরকে দিয়ে নতুন ঘরটার কড়িকাঠে পাটা বিছিয়ে করে দিলাম ওর থাকবার আস্তানা। গলায় বেল্ট পরিয়ে শিকল দিলাম বেঁধে। প্রথমে কতই না ছটফট করতে লাগল অনভ্যস্ত ওই বাঁধনের জ্বালায়! তারপর টানাটানি নাড়ানাড়ি করে যখন হয়রান হয়ে গেল, তখন সে তার ধূর্তামি বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল কড়িকাঠে।

অবসর পেলেই মন্টু, ঝন্টু, কালু দেখতে আসত মেনিকে। সুর করে বলত—

এই বাঁদরটা কলা খাবি—
জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি।

আমি বলতাম—ওর নাম বাঁদর নয়, মেনি। তোরা মেনি বলে ডাকবি।

দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাত মেনি। হাতে পায়ে কড়িকাঠের উপর ভর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভান করত মাঝে মাঝে। তাই দেখে ভারী মজা লাগত আমাদের, হাত চাপড়ে হেসে উঠতাম হো-হো করে।

বিকেল হলেই বেঁধে দিতাম মেনিকে বাইরে বাবলা গাছটার লাগালাগি আঞ্জির গাছটাতে। হাত বাড়িয়ে বাবলা পাতা খেত মেনি। খেলতে এসে ভিড় জমাত কালু বাবলুর দল। কারো হাতে আখ দেখলেই ঝুপ করে নেমে আসত মেনি। আখ খাবার ওটা যম। চারধারে ঘিরে দাঁড়াত সবাই, হাত চাপড়ে বলত—

বানরে উঠে তেঁতুল খায়
তারা নুন কোথায় পায়—
ওরা কাঁচা-পাকা খেয়ে দেয়ে
বনকে পালায়।

এ সব কথায় কান দিত না মেনি তবে কুকুর এলেই হোত বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে আখ ফেলে হয় গাছে উঠতো না হয় সামনে যাকে পেত গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জড়িয়ে ধরতো। চাকরটা বলতো—যাক বাবা মানুষ-ঘেঁসা হয়েছে।

বড় হয়ে উঠল মেনি কিন্তু ধূর্তামিটা গেল বেড়ে। ছাড়া পেয়ে সে হয়ে উঠল গোকুলের ষাঁড়। তরকারি কুটতে বসলে বেগুন শিম উধাও। কোত্থেকে এসে কখন যে নেবে কেউ টের পাবে না। সেদিন সাবিত্রীর উপোসের পর মা ফল খেতে গিয়ে দেখেন ঝুড়িতে একটা ফলও নেই। একে ওকে চোর ধরা হল, চারধারে

খোঁজাখুঁজির ধুম পড়ে গেল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলি পাওয়া গেল মেনির পুরানো আস্তানায়। নতুন ঘরের কড়িকাঠের পাশের জানলাটাতে মেনি পর পর সাজিয়ে রেখেছে—কলা, নেবু, শাঁখালু ইত্যাদি। হাসতে হাসতে বাবা বললেন—তোদের মত তো নয়—ওরও তো ভবিষ্যৎ আছে।

সেদিন দিদির শ্বশুর এলেন বাড়িতে। খুব নাকি সাহসী লোক তিনি। আমার শোবার ঘরটাতেই হোল তাঁর বিছানা। রাত তখন বেশ কিছুটা হবে—হঠাৎ কানে এল—ভুঁ—য়ুঁ—য়ুঁ—।

চমকে উঠলেন বাবা। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। দিদিমাও উঠে বসে বললেন—দেখ্ রে—দেখ্ কি হোল!

বাবা লাঠি আর আমি লণ্ঠন নিয়ে হাজির হলাম দিদির শ্বশুরের কাছে। উল্টো উল্টো চোখে থরথর করে কাঁপছেন তিনি। আর ছাড়া ছাড়া গলায় ক্ষীণ কণ্ঠে বেরিয়ে আসছে—ভুঁ—য়ুঁ—য়ুঁ। সঙ্গে সঙ্গে বাবা বেরিয়ে পড়লেন—একে ওকে ঘুম ভাঙিয়ে উঠিয়ে এনে জড় করলেন। তারপর চলতে লাগল জলের ঝাপ্টা আর বাতাস। যাক কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হলেন দিদির শ্বশুর। তাঁর মুখ থেকেই শোনা গেল ব্যাপারটা। বললেন—ঘুমটা ঠিক ধরেছে হঠাৎ কপাটটা ঠেলে কি একটা বানরের মত ঢুকল। ঢুকেই ওটা খাটটার পাশে উঠে বসল। হাত দিয়ে টিপে দেখি তুলোর মত গা-টা নরম। ও বাবা, যেই ছোঁয়া অমনি তড়াক করে সেটা আমার বুকে চেপে বসলো।

বলতে বলতে আবার চোখ দুটো বড় হয়ে আসতে লাগল দিদির শ্বশুরের। আমি চেঁচিয়ে বললাম—ও যে আমাদের মেনি। এখানে শুই বলে প্রত্যেক দিন ওটা খাটে এসে বসে। আমি ওর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ঘুমিয়ে পড়ি।

হঠাৎ আমার কথা শুনে খাটের তলা থেকে একটা খুঁক শব্দ করে বেরিয়ে এল মেনি। হেসে উঠল সবাই। বাবাও হাসতে হাসতে বললেন—বেয়াই মশায়ের এই সাহস!

কাচুমাচু খেয়ে ঢোক গিলতে গিলতে উত্তর করলেন দিদির শশুর—ভয় করিনি, তবে কিনা বুকের ওপর চেপে দাঁত খিঁচোতেই—

আবার উঠল হাসির হুল্লোড়। আমিও হাসতে লাগলাম সঙ্গে সঙ্গে।

লক্ষ্মী আমাদের শান্তশিষ্ট গাই। আমরাই কতবার ওর পেটের তলা দিয়ে ছুটোছুটি করেছি, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকেছে ও। যে কেউ বাঁটে হাত লাগাক নড়বে না। হঠাৎ কিন্তু সেদিন দুধ দিতে দিতে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল

লক্ষ্মী। গোয়ালঘরের সোজা রান্নাঘরটাতে বসেছিলাম মা আর আমি। মা বললেন—কি হোল রে ?

চাকরটা দুধ দুইছিল, গরুটার গায়ে-পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলল—ভিড়কে গেছে একটু। আবার দুধ দুইতে বসল সে, গাইটা কিন্তু ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে রইলো সামনের ভাঙা দেওয়ালটার দিকে। হঠাৎ দেখি সেই ভাঙা দেওয়ালটা থেকেই হাত-পা নেড়ে দাঁত খিঁচিয়ে এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি দেখিয়ে সরে গেল মেনি। অমনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠল গাইটা। উল্টে পড়ল চাকরটা একদিকে, দুধ সমেত হাতের ঘটিটাও ছিটকে পড়ল আর এক দিকে। হো হো করে হেসে উঠলাম আমি। গম্ভীর ভাবে মা বললেন—বেহায়ার মত হাসছিস যে—যা তাড়িয়ে দিয়ে আয়,—চমকে গেলে যে দুধ দেওয়া বন্ধ করবে।

সেদিন অমনি খেলছিলাম নীরদকাকার বাড়িতে। নতুন একটা পাকা বাড়ি তুলেছেন নীরদকাকা। উপরে বারান্দার সামনে টাঙিয়ে রেখেছেন কলকাতা থেকে আনা বেশ শৌখিন একটা বড় আয়না। সামনে আছে চেয়ার-টেবিল। হঠাৎ দেখি কোত্থেকে মেনি এসে চেপে বসল আয়নাটার সামনের টেবিলটাতে। আয়নাটায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে চমকে উঠল সে। অপর জানোয়ার ভেবে বার বার করে দাঁত খিঁচিয়ে ভয় দেখাতে লাগল সেটাকে। আমরা সবাই হো হো করে হেসে হেসে দেখতে লাগলাম বোকা মেনির কাণ্ডটা। হঠাৎ একটা চড় তুলে সজোরে বসিয়ে দিল মেনি আয়নাটাতে—সঙ্গে সঙ্গে চুরমার হয়ে গেল সেটা। মেনিও অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তমধ্যে। হায় হায় করে মাথায় হাত দিলেন নীরদকাকা। রণচণ্ডী মূর্তি ধরে বাক্যবাণ প্রয়োগ করতে করতে বেরিয়ে এলেন কাকীমা। গতিক গোলমাল দেখে মুখ চুন করে সরে পড়লাম আমি।

সীমা ছাড়িয়ে দিনের পর দিন বেড়েই চলল মেনির দৌরাত্ম্যটা। কখনও গোয়ালা পিসী এসে বলে—মোল্লের কঁচ ভেঙে দিয়েছে। কখনও বেনেবউ নালিশ জানায়—লক্ষ্মীছাড়া বাঁদরের জ্বালায় হাতের রুয়ো দুটো শিম বেগুনও মুখে দিতে হোল না! বুড়ো হাতে লাঠি কাঁপিয়ে কামারবউ এসে বলে—হ্যাঁগো, বাঁদর পুষেছো তো বেশ—এধারে আমার পিপে গাছটার যে শ্রাদ্ধ করল দেখেছো একবার! এমন কি সময় পেয়ে গগী ডোমও এসে শুনিয়ে দিয়ে যায়,—গরীব মানুষ চালে খড় যোগাতে পারিনি—আর তোমাদের পোষা বাঁদরটাতে ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে ভঙ্গলা করে দিচ্ছে দেখো একবার।

শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে যায়। অতিষ্ঠ হয়ে উঠে সেদিন ছলছলে চোখে মা বললেন—আজ পর্যন্ত কেউ কোনদিন একটা কথা বলতে পারেনি আর আজ তোর জন্যে ঘরে এসে বারলোকে কত কথা শুনিয়ে যাচ্ছে বল তো!

ভারী রাগ হোল মেনির উপর। সমস্ত কিছুর মূলেই তো মেনি। শুধু মাকে

কেন, দিদিমাকে বাবাকে কত অপমানই সহ্য করতে হচ্ছে দিন দিন। তার জন্যে দায়ী তো আমিই—আমিই তো এনেছি ওটাকে ঘরে। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম একটা ঠেঙা নিয়ে—যেখানেই থাক মেনি আজ ওকে মেরে তাড়াবই—চিরকালের মত তাড়াব, যেন কোনদিন সে এমুখো না হয়।

খিড়কিদরজা পেরোতেই চোখে পড়ল ডানহাতে বাম-বুকটা চেপে কিঁচমিঁচ করে ছুটে আসছে মেনি। হঠাৎ অদূরে নিমতলাটাতেই ধুপ করে পড়ে গেল সে, চেষ্টা করেও আর এগোতে পারল না। ভাবলাম এই তো সময়—দিই ঘা-কতক বসিয়ে! ঠেঙা উঁচিয়ে ছুটে গেলাম মেনির দিকে। কিন্তু একি! মেনির গোটা গায়ে যে রক্ত! বুক ফেটে ঝরঝর করে গড়িয়ে পড়ছে লাল রক্তস্রোত। ভিজে যাচ্ছে মাটিটা—হাত দুটোও গেছে লাল হয়ে। চীৎকার করে উঠলাম আমি—বাবা, বাবা, শীগ্‌গির এস, মেনিকে কে মেরে দিয়েছে।

শুনতে শুনতে ছুটে এলেন মা বাবা দিদিমা, ঘিরে দাঁড়ালেন মেনির চারধারে। ওধার থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে কাঁপা কাঁপা গলায় চাকরটা বলল—দাদাবাবু, দাদাবাবু—নীরবাবু গুলি মেরেছে মেনিকে।

কথাটা কানে যেতেই কেঁপে উঠল হৃদয়টা। ও বুঝেছি—নীরদকাকা এতদিনে প্রতিশোধ নিয়েছে তার শৌখিন ভাঙা আয়নাটার। এধারে মেনির তখন শেষ অবস্থা। পড়া রক্ত চাপ চাপ হয়ে বসে গেছে চারধারে—কাঁপছে তার শরীরটা থরথর করে। ছলছলে মিটমিটে তার করুণ চোখ দুটিতে শেষবারের মত দেখে নিচ্ছে একে ওকে। হঠাৎ সে অসহায় দৃষ্টি আমার চোখে পড়তেই হু হু করে উঠল মনটা। হাতের লাঠিটা দূরে ছুঁড়ে দিয়ে চীৎকার করে উঠলাম—মেনি—মেনি!

কাঁপা কাঁপা হাত দুটো উপর দিকে তুলে জোড়হাতে প্রণাম জানাল মেনি। তারপর ঢলে পড়ল তার মাথাটা, নিশ্চল হোল শরীরটা চিরকালের মত।

বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাবা বললেন—রামচন্দ্রের বাহন ওরা—তাই মরবার আগে তাঁকে প্রণাম জানাল।

মজার খেলা

তোমাদের বাড়িতে তোমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনেরা এলে তাদের নিয়ে এই খেলাটা খেলতে পার।

তারা যে ঘরে বসে আছে সেই ঘরটা তাদের পাঁচ মিনিট ভাল করে দেখে নিতে বল। পাঁচ মিনিট বাদে তাদের ঘরের বাইরে যেতে বল। ঘরের চেয়ারপত্র আরও সব জিনিস যা পার, এদিক ওদিক সরিয়ে সাজিয়ে, কি কি জিনিস এদিক ওদিক করলে, একটা ফর্দে লিখে রাখ। এইবার তাদের ঘরে ডেকে এনে জিজ্ঞেস কর, কি সব বদল হয়েছে? যার কথা ফর্দের সঙ্গে যত মিলবে, সে তত নম্বর পাবে। এইভাবে বার বার খেলে একশ' নম্বর যে আগে পাবে তার জিত হবে।

মীরা গোস্বামী স্মৃতি সাহিত্য-
প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়
পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

বীরত্ব

কুমারী শিখা সেন

"হ্যাঁ, আমরা তখন ফ্রণ্টে। জোর যুদ্ধ চলছে। রক্তে জমি লাল। এখানে ওখানে মৃতদেহ পড়ে আছে; সরাবারও উপায় নেই।"—গল্প বলে চলেছেন ক্যাপ্টেন গুপ্ত।

"যুদ্ধ করা মানুষের একটা ব্যাধির মত। কিন্তু স্বাধীনতা ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য যে যুদ্ধ, সেও কি একটা ব্যাধি? যদি খুঁটিয়ে বিচার করা যায় তবে মনে হয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করা রোগ নয়, সে হলো দাবি। হ্যাঁ, এই দাবি নিয়েই আমরা যুদ্ধ করে চলেছি, সেই ষোল বছর আগের বৃটিশ সিংহ, আজকের জরাজীর্ণ পশুটার সঙ্গে।

সেদিন পশুটা ছিল সতেজ, নখরে ছিন্ন করাই ছিল তার কাজ। তবু আমরা বিরত হইনি। মরেছি, তবু থামিনি। আমরা সৈনিক, আমরা হারতে পারি কিন্তু হার স্বীকার করতে পারি না।

এই মন্ত্রটা সঙ্গে নিয়েই পশুটার সঙ্গে লড়তে নেমেছিলাম আর লড়েছিলামও। রক্ত আর রক্ত। চারিদিকে খালি আর্তনাদ। সামনেই ট্রেঞ্চটা ভেঙে পড়লো। একটা চাপা আর্তস্বর ভেসে এল। পশু, আমাদের অন্তরের পশুগুলোও আজ জেগে উঠেছে। রক্ত—শুধু রক্ত। আজ চাই রক্ত।

আমরা আপ্রাণ যুদ্ধ করে চলেছি। সকাল থেকে মুখোমুখি যুদ্ধে কেউ কাউকে হটাতে পারিনি। রাতের দিকে আক্রমণটা থেমে এল। ট্রেঞ্চে ফিরে ডেকে পাঠালাম 'বোস'কে। গোটাকতক ধমক দিলাম ওর troop এর অকর্মণ্যতার জন্য। তারপর শুয়ে পড়লাম। একটু বিশ্রাম দরকার। ঘণ্টা দুয়েক পরে ঘুমটা

ভেঙে গেল একঝাঁক গুলির গর্জনে। ছুটে গেলাম। স্টিক টেনে চলেছি সমানে। আমার সামনেই একটা প্লেন ভেঙে পড়লো।

চারিপাশে বৃষ্টির মত বোমা পড়ছে। সামনেই একটা শেল ফাটলো, এই বুঝি বোমার টুকরো এসে আমাকে এ জীবন থেকে মুক্তি দেবে। একটা টুকরোও আমার গায়ে লাগলো না। কে যেন আমার সামনে দ্রুত এসে আড়াল করে দাঁড়ালো। হঠাৎ চোখে পড়ে—সামনে ও কার দেহ? দেহটা ঘিরে রক্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। দেহটাকে উলটে দিলাম।

বোস? বুঝতে বাকী রইলো না। চেঁচিয়ে উঠলাম। অকর্মণ্যতার জন্য যাকে বকেছিলাম একটু আগে, সেই-ই বাঁচালো আমায়। একি করলে বোস? তুমি একি করলে?

সমস্ত শক্তি জড় করে ও বলে উঠলো—'গুপ্ত! একটা বোস গেলে আর একটা বোস আসবে, কিন্তু একটা গুপ্ত গেলে তো আর গুপ্ত আসবে না।' বলেই পড়ে গেল। দেহটা ওর নিথর হিম হয়ে গেছে। চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

হ্যাঁ, এরাই সেই বীর; এদের জন্যই আজও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বেঁচে আছে মানুষের অন্তরে।"

গল্প শেষ করলেন ক্যাপ্টেন গুপ্ত। ঘর নিস্তব্ধ, সব চুপ। আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরছে।

বৈশাখ মাসের আংশিক সূচী

১। সামনের পাতার প্রচ্ছদপট আবার নতুন দেওয়া হবে।

২। বনফুলের লেখা।

৩। ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের লেখা।

৪। বুদ্ধির খেলা—সমস্যাটি ঠিক ঠিক সমাধান করতে পারলে তোমরাই ছোট ছোট ডিটেকটিভ হয়ে যাবে। তখন ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের ডিটেকটিভ কিরীটী হয়তো তোমাদেরই বলবেন তাঁর নিজের সমস্যার সূত্র খুঁজে দেবার জন্যে।

৫। উপকথা, আরো গল্প, ধাঁধা, উজল পাতা, আরো কত কি।

মজার পাতা

নূতন ধাঁধা

১। বিদেশী ভাষায় কে ?
সারা দুনিয়ার স্বাস্থ্য লইয়া
আলোচনা করে সে।

—বাপ্পা সেন ও পম্পা সেন (১৮৫১), কলিকাতা।

২। শব্দটির প্রথম অংশ একটি বৃক্ষবিশেষ, শেষের অংশ উহার স্বাদবিশেষ। সবটা মিলে একটি জায়গার নাম।

—শ্রীনিবারণচন্দ্র বড়াল, মেদিনীপুর।

৩। সেদিন প্রদর্শনীতে বোতলের মধ্যে একটা বেগুন দেখলুম। বেগুনটা এত মোটা যে বোতলের ভেতরে কাঁচের প্রায় দুদিকে ঠেকে আছে। বোতলের মুখটা বেশ সরু। তাতে আবার ছিপি দেওয়া। সে বোতলের মুখ দিয়ে ঐ বেগুনটা তো দূরের কথা তার অর্ধেক মোটা বেগুনও ঢোকে না। বোতলে কোন ভাঙা-জোড়ার চিহ্নই নেই। মনে হোল গরমে বোতলটা বাড়িয়ে বেগুনটা ঢুকিয়ে দিয়েছে। তোমরা বলতে পার বেগুনটা কি করে বোতলে পোরা হোল ?

—অলক ঘোষ, কলিকাতা।

গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। যতীন ২। কুবলয় ৩। আলাবামা (যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য)

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—বাচ্চু, ছট্টু, রুমু, শংকরী, মা ও দাদুমামা—বালীগঞ্জ স্টেশন রোড; কল্যাণী, বন্দনা, অরূপ ও মিতালী বর্মন—মহানির্বাণ রোড; দেবী, বাণী, নন্দিনী, শুভেন্দু ও শ্যামল—কলিকাতা-৩৬; সত্য, তুলু, রাণু, শ্যামা, সমি ও মা—দ্বারকানাথ ঘোষ লেন; বাচ্চু, তুলতুল, রঞ্জন, বাবলু, তপু, ছক্কু ও মা—১৬১৬৬; সুধাংশু-শেখর মণ্ডল—প্রামাণিক ঘাট রোড; ভারতী রায় চৌধুরী ও ইন্দ্রাণী দাশগুপ্তা—রামকৃষ্ণ লেন; অমর, পিনাকী, অসিত ও অলক—তালতলা এভেনিউ; প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়—চোরবাগান লেন; সুমিতকুমার দাস—১৬১২৮।

চব্বিশ পরগনা—গীতা, অজিত, বিজয়া, এম্পি মিত্র ও চন্দ্রা গুহ—মধ্যমগ্রাম; সুবিনয়কান্তি সাহা—সোদপুর; অরুণকুমার গাঙ্গুলী—খড়দহ।

হাওড়া—সুনীল মান্না ও নগেন সামন্ত—১৫৮৭১; অমিতাভ, মঞ্জু ও সমীরণ মুখার্জী—সালকিয়া; গৌর-গোপাল চক্রবর্তী—গুপ্তিপাড়া।

হুগলী—বিজনবিকাশ দে—হুগলী; হরেন আদক ও জিতেন মাইতি—বালিপুর স্কুল; দাদুরা, কাকারা ও বিশ্বনাথ বসাক—চন্দননগর; বিজয়ভূষণ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণুপদ মুখোপাধ্যায় ও অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়—গুপ্তিপাড়া।

নদীয়া—অবীরানন্দ, নির্মল ও কানাই—কৃষ্ণনগর।

বর্ধমান—জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রণব বসু ধর ও প্রবীর বসু ধর—রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল, আসানসোল; সন্তোষ চক্রবর্তী, পরিতোষ স্টোর্স, রকমারী ও বিমলদা—আসানসোল; দিলীপ, প্রদীপ, ঝুমু, বিদ্যুৎ, পুলক, সেবা, বাবু, তাপু প্রভৃতি—ভিক্টোরিয়া কোলিয়ারী; জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—বড়-বহরকুলি নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, সিঙ্গারকোণ; অঞ্জলি, খোকন, বাচ্চু, কুট্টি, জবা, নাইটদা ও শান্তিদা—আসানসোল।

বীরভূম—প্রবোধকুমার দত্ত—মুরারই।

মালদহ—মোহন, জয়দেব, আলো, শিবা, নন্দদেবী

[এর পর ১৭৩ পৃষ্ঠায় দেখ

দাদুমণির চিঠি

শুকতারার বন্ধুরা,

গতবারের চিঠি আশা করি ভোল নি···

এ চিঠি তারই জের···

চারদিকে গুজব রটে গিয়েছে, বিংশ-শতাব্দীর এটমিক যুগে ভগবান নিশ্চিহ্ন হয়ে মরে গিয়েছেন···আমরা বেরিয়েছি বিচিত্র এক অ্যাডভেঞ্চারে, মৃত বা জীবিত ভগবানের সঠিক খবর আনবার জন্যে···

পথে বেরিয়ে বন্ধু হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে পড়ে, আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে, আমরা যে মৃত বা জীবিত ভগবানের খবর আনতে চলেছি, ভগবান কি কোনদিন জীবিত ছিলেন? স্টানলী মৃত বা জীবিত লিভিংস্টোনের খবর আনতে বেরিয়েছিলেন, তার কারণ তিনি জানতেন, লিভিংস্টোন বলে সত্যি একজন লোক ছিলেন! মূলে যদি ভগবান বলে কেউ না থাকে, তাহলে এ অ্যাডভেঞ্চার শুধু পণ্ডশ্রম হবে না?

বন্ধুকে আশ্বস্ত করে বলি, কোন ভয় নেই, ভগবান ছিলেন এবং আছেন, তারই খবর আগে আমরা খুঁজে বার করবো···সেইটেই আমাদের আসল অ্যাডভেঞ্চার···

আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে না···

বন্ধু রুখে ওঠে, কখনই নয়···আপনি রবি ঠাকুরের কবিতা শুনিয়ে বলবেন, এই দেখ বিশ্বকবি ভগবানে বিশ্বাস করতেন···মহাত্মা গান্ধী ভগবানে বিশ্বাস করতেন···শাস্ত্র থেকে সংস্কৃত আওড়ে বলবেন, এই দেখ আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা ভগবানকে প্রত্যক্ষ দেখে জেনে এই সব লিখে গিয়েছেন···ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা তুলবেন···ওসব চলবে না···

বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবীতে এমন কেউ আছেন, যাঁর কথা তুমি মেনে নিতে রাজী আছ?

—নিশ্চয়ই···এটা বিজ্ঞানের যুগ···বিজ্ঞানই একমাত্র সত্য···বিজ্ঞান যা অবিশ্বাস করে, আমরা কিছুতেই তাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না!

—বেশ, তাই হবে বন্ধু···চল বৈজ্ঞানিকদের কাছেই যাই···

নিস্তব্ধ এক বাড়ির সামনে এসে কড়া নাড়ি···

—এখানে কেন?

—এখানে এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আঙ্কিক থাকেন···সমস্ত বিজ্ঞানের মূল হচ্ছে অঙ্ক···অঙ্কের মধ্যে কোন বুজরুকি নেই, কোন কল্পনা নেই, নিখুঁত নির্জলা হিসাব··· এক আর একে দুই···সর্বপ্রথম এঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক···

দরজা খুলে প্রৌঢ় আঙ্কিক বেরিয়ে আসেন···সংখ্যা গুনতে গুনতে সমস্ত চেহারাটা সংখ্যার মতন শুকনো হয়ে গিয়েছে···মুখটা বাংলা পাঁচের মতন, চোখ দুটো দুটো-গোল-জিরোর মতন উদাসীন···

দরজা খুলেই রুক্ষকণ্ঠে বলেন, কেন বিরক্ত করতে এসেছ ?

বিনীতকণ্ঠে বলি, আপনার কাছে জানতে এসেছি···আপনার অঙ্কশাস্ত্রে ভগবানের কোন সন্ধান পেয়েছেন কি না ?

জিরোর মতন উদাসীন দুটো চোখ যেন নড়ে উঠলো···শূন্যের বাঁদিকে যেন হঠাৎ অনেকগুলো সংখ্যা বসে গেল···

—ভেতরে এসো···

চারদিকে মোটা মোটা সব অঙ্কের বই···সামনেই মস্ত বড় একটা অঙ্কের বই খোলা পড়ে রয়েছে···ফরাসীভাষায় লেখা···

স্তব্ধ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি···

আমাদের দিকে চেয়ে বলেন, অঙ্ক জান ?

বন্ধু ইতস্ততঃ করে···আমিই উত্তর দি, আজ্ঞে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অঙ্কতে letter পেয়েছিলাম···

—আশু মুখুজ্যের আমলে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ !

—তাহলে অঙ্কের কিছুই জান না দেখছি···আশু মুখুজ্যের আমলে গুনতে জানলেই অঙ্কের পেপারে পাস করা যেতো···higher mathematics-এর কিছু জান ?

সভয়ে বলি, শুনেছি higher mathematics বলে একটা জিনিস আছে, যেমন শুনেছি নাইগ্রা ফল্‌স্ আছে, মাউন্ট এভারেস্ট আছে···

তর্জন করে ওঠেন, তাহলে কি করে অঙ্ক দিয়ে তোমাকে বোঝাব ? Chance-এর অঙ্ক কোনদিন কষেছ ?

—তাতে কি আমার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে ?

বন্ধু চোখ বড় করে আঙ্কিকের মুখের দিকে চেয়ে থাকে···

গম্ভীরকণ্ঠে তিনি বলেন, কবিত্ব ছেড়ে দিয়ে ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে তা হলো··· এই যে পৃথিবী, মানুষ, পশু-পাখী, গাছ-পালা, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শীত, ঐ আকাশ···গ্রহনক্ষত্র কোটি কোটি···চন্দ্র-সূর্য···আকাশে নিত্য অস্ত আর উদয়··· এই যে বিরাট সৃষ্টি···বৈজ্ঞানিকেরা দেখলো এই বিরাট সৃষ্টির প্রত্যেকটি জিনিস একটার সঙ্গে আর একটা একেবারে অঙ্ক-কষে নিখুঁতভাবে সাজানো···তাই বৈজ্ঞানিকেরা আঙ্কিকের কাছে জানতে চাইলেন, এই যে একটার-পর-একটা নিখুঁতভাবে সাজানো এটা chance-এর ব্যাপার, মানে এমনি আপনা থেকে হয়ে উঠেছে, না, কেউ ইচ্ছে করে এইভাবে তাকে সাজিয়েছে ?

আবেগের মাথায় বন্ধু বলে ওঠে, বিজ্ঞান তো বলে এ-সব আপনা থেকেই evolved হয়েছে, মানে গড়ে উঠেছে !

আঙ্কিক ধমক দিয়ে ওঠেন, থামো জ্যাঠা ছোকরা! জিনিসটা যদি অত সহজ হতো তাহলে বৈজ্ঞানিকেরা আঙ্কিকের কাছে আসতো না! আন্দাজে উত্তর দিলে আমাদের চলে না, সব জিনিসই অঙ্ক কষে উত্তর দিতে হয়···এইখানেই chance-এর অঙ্কের দরকার হয়···একটু দাঁড়াও···

আঙ্কিক একটা সাদা কাগজ নিয়ে তাকে ছিঁড়ে ছোট ছোট দশটা টুকরো করেন···প্রত্যেক টুকরোর ওপর ১ থেকে পর পর ১০ পর্যন্ত সংখ্যা বসান···তারপর সেগুলো সংখ্যা-অনুযায়ী পর পর সাজান, এক-এর পর দুই, দুই-এর পর তিন···এই-ভাবে দশ পর্যন্ত···

—এই দেখ, মাত্র দশটা জিনিস পর পর সাজানো···১ নম্বর থেকে পর পর ১০ নম্বর পর্যন্ত···এগুলো যদি গুলিয়ে দিই, ক' chance-এর চেষ্টায় আবার একবার এইরকম সাজানোভাবে তুলতে পার?

বন্ধু কি একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি তার মুখ চেপে ধরি···

আঙ্কিক বলেন, অঙ্কশাস্ত্রের হিসেবে তুমি দশবার chance নিলে মাত্র একবার প্রথমে ১ নম্বর তুলতে পারবেই···১ আর ২ পর পর একসঙ্গে তুলতে হলে তুমি একশো-বারের মধ্যে একবার পারবেই···এইভাবে পর পর ১ থেকে ১০ পর্যন্ত একবারে সাজিয়ে তুলতে তোমার দশ হাজার মিলিয়ন chance নিতে হবে···এই হলো মাত্র দশটা জিনিস নিয়ে···এই থেকে অনুমান করতে পারবে, পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির জন্যে পর পর এত জিনিস একসঙ্গে সাজাতে হয় যা কখনই chance-এর দ্বারা সম্ভব নয়!

বন্ধু মুখ লম্বা করে আঙ্কিকের দিকে চায়!

—অমন করে চাইছো কি? একটা সামান্য পোকা থেকে ঐ লক্ষ লক্ষ মাইল দূরের নক্ষত্র পর্যন্ত নিখুঁত অঙ্কের হিসেবে সাজানো···এই সাজানোর একটা সামান্য জিনিসের হেরফের হলে, সমস্ত সৃষ্টি ছারখার হয়ে যাবে···লক্ষ লক্ষ জিনিসের ভেতর দিয়ে এই নিখুঁত হিসেব বিনা মস্তিষ্কে আপনা-আপনি কখনই ঘটে উঠতে পারে না···পৃথিবী তার নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ঘণ্টায় হাজার মাইল বেগে ঘুরছে···এই হাজার-মাইল-বেগের হেরফের হবার জো নেই, হেরফের হলেই পৃথিবীর চেহারা বদলে যাবে···ঠিক যতখানি দূরে থাকলে পৃথিবী সূর্যের কাছ থেকে প্রাণ-দায়ী উত্তাপ পাবে, ঠিক ততখানি দূর থেকেই পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, এই দূরত্বের হেরফের হলেই সূর্যের প্রচণ্ড আগুনে জ্বলে যাবে পৃথিবী···পৃথিবী ২৩ ডিগ্রি angle-এ কাত হয়ে ঘুরছে, এইটুকু কাত হয়ে না ঘুরলে সমুদ্রের সব বাষ্প উত্তর আর দক্ষিণ দিকে জমা হয়ে হয়ে সব মহাদেশকে তুষার-মহাদেশে পরিণত করতো···চাঁদ যদি পৃথিবীর আর খানিকটা কাছে থাকতো, তাহলে সমুদ্রে এমন তরঙ্গ উঠতো যে

দিনে দুবার করে সব দেশ জলে ডুবে যেতো…পৃথিবীর বাইরের আবরণ যদি আর মাত্র দশ ফিট বেশী পুরু হতো, তাহলে পৃথিবীতে কোন অক্সিজেন থাকতো না, অক্সিজেনের অভাবে কোন প্রাণীই এখানে টিকে থাকতো না…সমুদ্রের গভীরতা যদি আর মাত্র কয়েক ফুট বেশী হতো, সমস্ত কার্বন ডাইওক্সাইড্ আর অক্সিজেন সমুদ্র শুষে নিতো, পৃথিবীতে গাছ-পালা শস্য জন্মাতো না…এই রকম আরো বহু বহু উদাহরণ দেওয়া যায়, যা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, পৃথিবীতে প্রাণের জন্ম হঠাৎ একদিন আপনা থেকেই সম্ভব হয় নি…এই বিরাট অঙ্ক-সম্মত প্লানের পেছনে নিঃসন্দেহে একটা মস্তিষ্ক আছে…প্লান করেছে এমন কোন কর্তা আছে…নইলে এমন নিখুঁত পারম্পর্য কখনো আপনা থেকে হতে পারে না…এই আমার অঙ্কশাস্ত্রে বলে !

বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি…

মুখ গম্ভীর করে বন্ধু বলে, ঠিক বোঝা গেল না !

আশ্বাস দিয়ে বলি, আরো বৈজ্ঞানিক আছেন…চল তাঁদের কাছে যাই !

আবার দুজনে হাঁটতে শুরু করি…

—দাদুমণি

গত মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

[১৬৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

ও চন্দ্রশেখর—রথবাড়ি ; কল্যাণী, বাণী, রাণু, ভারতী, শ্যামল ও মলয়—মহদীপুর।

বাঁকুড়া—আর. সেন, আর. চ্যাটার্জী ও এস. জমিদার —বেলিয়াতোড় ওল্ড বোর্ডিং হাউস ; গণা, দামু, সুধীর ও গোবিন্দ—বাঁকদহ নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয় ; নিরু, হারু, মানু, দুর্গাদাস, স্বপন ও তপনবাবু—হাট-আশুরিয়া ; ধীরেন্দ্র মুখার্জী ও গোপাল ভাণ্ডারী—শালডাঙ্গা ; স্বপন, রবি ও রণজিৎ—শালডাঙ্গা ; আমি, সুনীল, মানিক, সন্ধ্যা ও হেনা—খাঁড়ারী ; গদাই, শংকর, যাবু, আনু ও নতুনবৌদি—বিষ্ণুপুর ; দেবপ্রিয়, সন্ধ্যাবৌ, বাসন্তী ও বেলাদি—নূতনগঞ্জ ; প্রণব, তিমিরবরণ, বৈদ্যনাথ, ছাতু ও রামলোচন—বেলিয়াতোড়।

মেদিনীপুর—অনুরাধা পাণ্ডে, প্রশান্তকুমার চৌবে ও দেবযানী পাণ্ডে—রামচন্দ্রপুর ; সরোজকুমার রায়—দাঁতন ; উমাচরণ, অশোককুমার, রমা ও শৈলেশ মুখার্জী—দেওয়ানখানা ; কল্পনা, বুলু, দীপ্তি, অচিন, গদাধর ও মাস্টার মশাই—খড়ার।

মুর্শিদাবাদ—মনোরঞ্জন বিশ্বাস—১৫৬৯২।

পুরুলিয়া—দিবাকর, জঙ্গলাল, হীরালাল, মানিক, সুনীল, অশোক প্রভৃতি—জনার্দনডিহি।

দার্জিলিং—রাধারানী আঢ্য—বেলগাছি।

বিহার—পরিমল, সুবিমল, সুকমল ও সুরভি দত্ত—জামসেদপুর ; অসিতকুমার ভট্টাচার্য—হাজারিবাগ ; বেলা, হেমন্ত, বড়দা, গোরা ও মা—২০০৬৩ ; দেবব্রত দত্ত—চিরকুণ্ডা ; বাসু, সুব্রত, পাপিয়া, বাণী দে ও অরুণ দে—কাটিহার ; শংকর, নারায়ণ, কল্পনা, উমা, ঝণ্টু, গোবিন্দ, ঈশ্বর ও বীণা—দানাপুর।

উড়িষ্যা—কৃষ্ণা চট্টোপাধ্যায়—কটক-২।

আসাম—চন্দন ভট্টাচার্য—১৪৫৫৮।

ত্রিপুরা—অজিত ও হীরালাল—রাধাকিশোরপুর।

উত্তরপ্রদেশ—মা, বাবা, নীলমণি, মৃণাল, রায়কাকু, স্বপন ও কাকীমা—আর্মাপুর এস্টেট, কানপুর।

মহারাষ্ট্র—সুমিত রায়—নাগপুর ; দীপক, বেলা, শীলা, পুলক, রূপক ও কনক সুর—১৬৫২১।

পাকিস্তান—মা, দিদি, ভাই, শর্মিষ্ঠা ও শ্যামল—১৬৪০৪।

টেলি : বিদ্যাসেবা পো: বক্স : ৯৯১

জাতির শিল্প, সংস্কৃতি ও উন্নতির মূলভিত্তি

কাগজ

ভোলানাথ পেপার হাউস লিঃ

হেড অফিস :—৩২এ, ব্রাবর্ন রোড, কলিকাতা—১

ফোন :—২২-১৫৩২ ও ২২-১৫৩৩

সর্বপ্রকার দেশী ও বিলাতী কাগজ, বোর্ড, ছাপার কালি ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ব্রাঞ্চ :—১৬৭ নং, ওল্ড চীনাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা

১৩৪।৩৫ " " " "

৬৪ নং, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ফোন নং : ৩৪-৪৯৮৯

মফঃস্বল ব্রাঞ্চ :—এলাহাবাদ, পাটনা, রাঁচি ও কটক

অলঙ্কার শিল্পে আধুনিকতম বৈচিত্র্যময় অভিনব সুপ্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান

শ্রীবিষ্ণু জুয়েলারী

ফোন - ৩৪-৪৮৭৭

১২৫এ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

"শ্যামলী" "শ্রীকান্ত" "ডাকবাংলো" নাটকের স্মারক উৎসবের উপহার নির্ম্মাতা।

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক দেব-প্রেস, ২৪নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ২২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য—৫০ নয়া পয়সা

দেব সাহিত্য-কুটীর সম্পাদিত

ঠানদিদির থলে

অসংখ্য ছবি

আধুনিক গেট্ আপ্—দাম ৩৲

ঠাকুরমার ঝুলি

॥ দাম তিন টাকা ॥

রাক্ষস খোক্কস

॥ দাম তিন টাকা ॥

ভূত-পেত্নী

দত্যি-দানা—৩৲

● স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত শিশু নাটক ●

বুড়ীবালামের তীরে ১৲ কেদার রায় ... ৶০
গুরুদক্ষিণা ... ॥০ মহারাজ নন্দকুমার ১৲
জাগোরে ধীরে ... ॥৵০ যুগাবতার রামকৃষ্ণ ॥৵০
বিশ বছর আগে ॥৵০ স্বাধীনতা জাগলো ॥০
বিদ্রোহী ৶০ উৎসব ॥৵০ মুক্তিপথে ৶০ বীর শিবাজী ৶০ চন্দ্রগুপ্ত ॥৵০ কর্ণার্জ্জুন ৶০ সিরাজের স্বপ্ন ৶০ বন্দীবীর ৶০ বীর মোহনলাল ৶০ সিপাহী বিদ্রোহ ১৲ জ্যান্ত ভগবান ॥৵০ বাংলার বিবেক ॥৵০ বিজয় সিংহ ॥৵০ কুশধ্বজ ॥৵০
প্রতাপ সিংহ ... ৶০

পুরুষ ভূমিকা বর্জিত মেয়েদের নাটক

বিধায়ক ভট্টাচার্য্য প্রণীত

মাটির ঘর ৶০
ঝাঁন্সীর রাণী ৶০

স্বপন বুড়ো'র

বাণী ... ... ॥৵০
শিশুনাটিকা (ছেলেমেয়েদের জন্য) ॥৵০

● আবার বাহির হইল ●

দেব দেউল (পূজা বার্ষিকী) ... ৫৲

দৃষ্টিহীনের

নূতন উপন্যাস

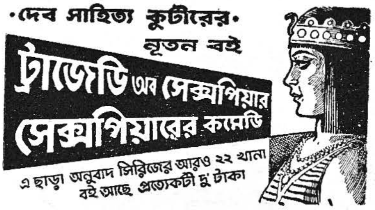

মরণদূতের আনাগোনা—২৲ বটকালীর জঙ্গলে—২৲ মা! আমি অশোক—১৲

দেব সাহিত্য-কুটীর—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

DICTIONARIES

by

A. T. DEV

English to Bengali

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৮৲
National Dictionary	৬৲
Jewel Dictionary	৫৲
Pocket Dictionary	৪৲

Bengali to English

Favourite Dictionary	১০৲
Dev's Concise Dictionary	৬৲
Students' Dictionary	৬৲
Pocket Dictionary	২॥০

Bengali to Bengali

নূতন বাঙ্গালা অভিধান	২০৲
শব্দবোধ অভিধান	৮৲
ছাত্রবোধ অভিধান	৬॥০
সরল অভিধান	৩৲
পকেট প্রকৃতিবোধ অভিধান	২৲
নব বিধান	৬৲

● কি বই পড়বেন দেখুন ●

দাম পাঁচ টাকা

● জীবনী ●

লোকমান্য তিলক ... ... ২৲

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের
কত গান তো হোলো গাওয়া
দাম তিন টাকা

● অ্যাড্‌ভেঞ্চার ●

বটকালীর জঙ্গলে ... ... ২৲

শিবরাম চক্রবর্ত্তীর
হিপ্ হিপ্ হুর রে

● কিশোর নাটক ●

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ৸০

নেতাজী জিন্দাবাদ ৸০

ফুলের ডালি

পুরুষ ভূমিকা বর্জ্জিত মেয়েদের

● নাটক ●

বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের

মাটির ঘর ... ৸০ ঝান্সীর রাণী ... ৸০

স্বপন বুড়োর

বাণী ... ... ॥৵০

শিশু নাটিকা (ছেলে-মেয়েদের জন্য) ... ॥৵০

এ ছাড়া

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জ্জিত ২৫খানা নাটক আছে।